# হাজার বছর ধরে

জহির রায়হান

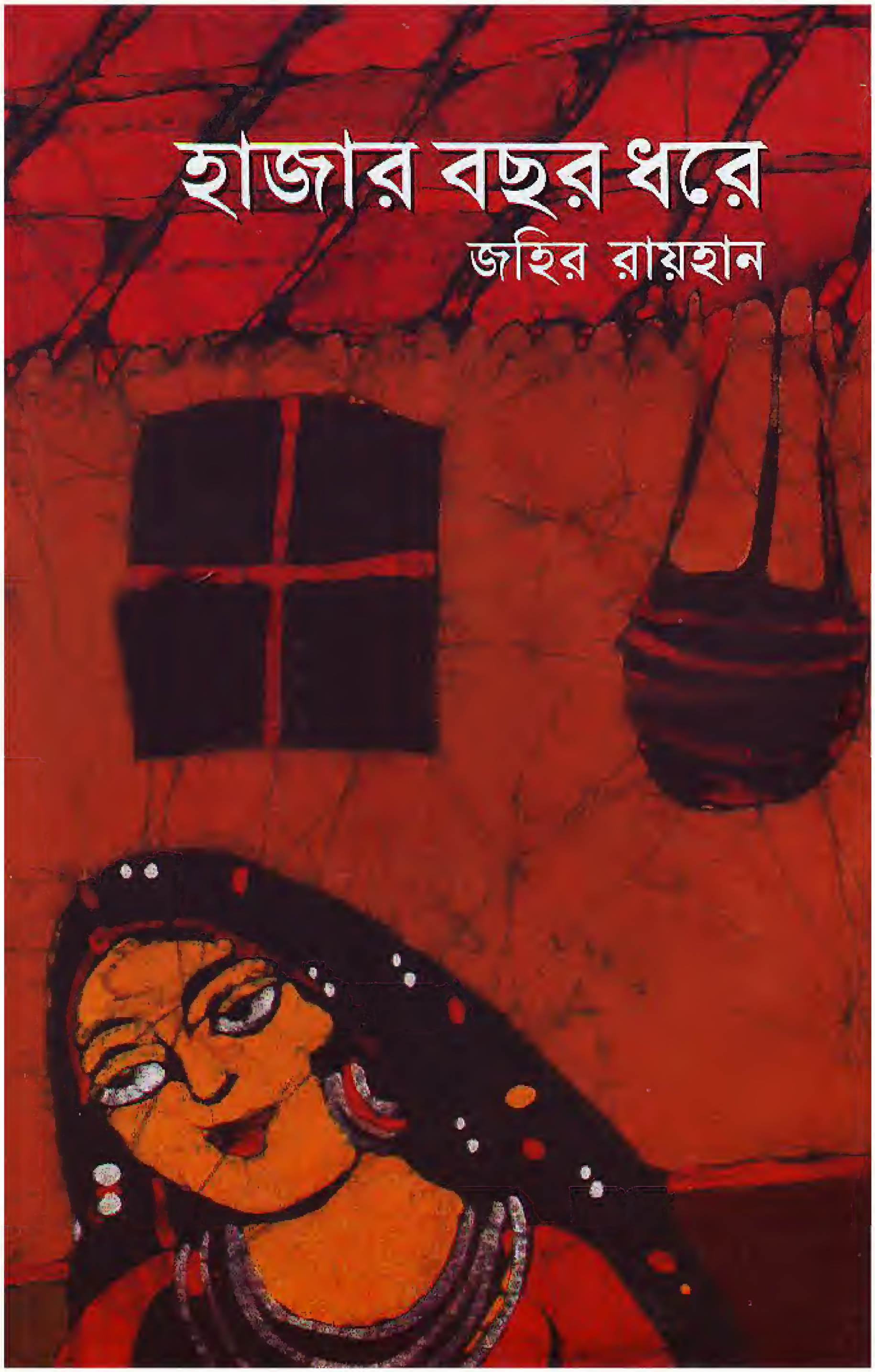

উৎসর্গ

অগ্রজ

শহীদুল্লাহ কায়সারকে

## ॥ এক ॥

মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে।

মোগলাই সড়ক।

লোকে বলে, মোগল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ্ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিলো এই সড়ক।

দু-পাশে তার অসংখ্য বটগাছ। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দীর্ঘকাল ধরে। ওরা এই সড়কের চিরন্তন প্রহরী।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা।

মাঝে মাঝে ধানক্ষেত সরে গেছে দূরে। দু–ধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি। অথৈ পানি। শেওলা আর বাদাবন ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগুনতি শাপলা ফুল।

ভোর হতে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা ছুটে আসে এখানে। একবুক পানিতে নেমে শাপলা তোলে ওরা। হৈ-হুল্লোড় আর মারামারি করে কুৎসিত গাল দেয় একে অন্যকে। বাজারে দর আছে শাপলার। এক আঁটি চার পয়সা করে।

কিন্তু এমনও অনেকে এখানে শাপলা তুলতে আসে, বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা যাদের ইচ্ছে নয়।

মন্তু আর টুনি ওদেরই দলে।

ওরা আসে ধল-পহরের আগে, যখন পুব আকাশে শুকতারা ওঠে। তার ঈষৎ আলোয় পথ চিনে নিয়ে চুপিচুপি আসে ওরা। রাতের শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে। টুনি ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মন্তু নেমে যায় পানিতে।

তারপর, অনেকগুলো শাপলা তুলে নিয়ে, অন্য সবাই এসে পড়ার অনেক আগে সেখান থেকে সরে পড়ে ওরা।

পরীর দীঘির পারে দুজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। শাপলার গায়ে লেগে–থাকা আঁশগুলো বেছে পরিষ্কার করে।

মন্তু বলে, বুড়া যদি জানে তোমারে আমারে মাইরা ফালাইবো।

টুনি বলে, ইস, বুড়ার নাক কাইটা দিমু না।

নাক কাইটলে বুড়া যদি মইরা যায়।

মইরলে তো বাঁচি। বলে ফিক করে হেসে দেয় টুনি। বলে, পাখির মতো উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু। বলে আবার হাসে সে, সে হাসি আশ্চর্য এক সুর তুলে পরীর দীঘির চার পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এ দীঘি এককালে এখানে ছিলো না।

আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োদের প্রশ্ন করলে তারা মুখে–মুখে বলে দেয় এ দীঘির ইতিহাস। কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে। কেউ শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে।

তার বাবা জেনেছে তার দাদার কাছ থেকে। আর তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে।

সে অনেক বছর আগে।

তখন গ্রাম ছিলো না। সড়ক ছিলো না। কিছুই ছিলো না এখানে। শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। সীমাহীন প্রান্তর।

বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে, পরীরা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। ওরা নাচতো গাইতো খেলতো।

লালপরী, নীলপরী আর সবুজপরী। পরীদের অনেকের নামও জানা আছে এ গাঁয়ের লোকের। পুঁথিতে লেখা আছে সব।

একদিন হঠাৎ পরীদের খেয়াল হলো, একটা দীঘি কাটবে। যার পানিতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে ওরা। ডুব দিয়ে, পানি ছিটিয়ে ইচ্ছেমতো হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে।

যেই চিন্তা সেই কাজ।

আকাশ থেকে খন্তা কোদাল আর মাটি ফেলবার ঝুড়ি নিয়ে এলো ওরা।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত।

রুপোলি জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় ভরে ছিলো এই সীমাহীন প্রান্তর। দক্ষিণের মৃদু বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো পরীদের হাসির শব্দে।

কথায় গানে আর কাজে।

রাত ভোর হবার আগে দীঘি কাটা হয়ে গেলো।

পাতাল থেকে কলকল শব্দে পানি উঠে ভরে গেলো দীঘি।

সেই দীঘি।

তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। এক নয়, অনেক।

গভীর রাতে ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম করে গ্রামগুলো।

জোড়া-বউকে ঢেঁকির উপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়ো মকবুল। পিদিমের শিখাটা ঢেঁকির তালে তালে মৃদুমৃদু কাঁপে।

মকবুল ধমকে ওঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নাই? এত আস্তে ক্যান। আরো জোরে চাপ দাও না, হুঁ। এমনভাবে গর্জে ওঠে মকবুল যেন ক্ষেতে লাঙল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু-জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে। হুঁ, হুট হুট। হুঁ, আরো জোরে। আরো জোরে।

ধমক খেয়ে ঢেঁকিতে আরো জোরে চাপ দেয় ওরা। টুনি আর আমেনা। পাশের বাড়ি থেকে আম্বিয়ার গান শোনা যায়। 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে।'

ঢেঁকিতে চড়েই গান গাওয়ার শখ চাপে আম্বিয়ার। সতেরো-আঠারো বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি ওর। আঁটসাঁট দেহের খাঁজে খাঁজে দুরন্ত যৌবন, আট-হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙে ফেটে পড়তে চায়। চেহারায় মাধুর্য আছে। চোখজোড়া বড় বেশি তীক্ষ্ণ। ঢেঁকিতে চড়লে, ঢেঁকিকে আর সুখ দেয় না ও। এত দ্রুত তালে ধান ভানতে থাকে, মনে হয় ঢেঁকিটাই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ধান ভানা শেষ হলে গায়ে দরদর ঘাম নামে ওর। একটা চাটাইয়ের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস নেয় আম্বিয়া।

ঢেঁকির পাশে বসে সেইমুহূর্তে বারবার আম্বিয়ার কথা মনে পড়ছিলো বুড়ো মকবুলের। দাঁতমুখ খিঁচে বউদের আবার ধমক মারলো ও,—শুনছনি, আম্বিয়া কেমন ধপাস ধপাস কইরা ধান বাইনতাছে। আর তোরা, কিছু না, কিছু না— বলে বারকয়েক মাটিতে থুতু ফেললো মকবুল। বাঁ হাতে কপালের ঘামগুলো মুছে নিল সে।

দাওয়ার ওপাশে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো ফকিরের মা। সেখান থেকে বললো, আহা মকবুল। বউগুলারে বুঝি এই রাতের বেলাও আর শান্তি দিবি না তুই। সারাদিন তো খাটাইছস, এহন এই দুপুর রাইতেও— বলে টুনি আর আমেনার জন্য আফসোস করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলো ও।

এ বাড়িতে মোট আট ঘর লোকের বাস।

সামনে নুয়ে-পড়া ছোট ছোট ঘরগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। বাঁশের তৈরি বেড়ার ভাঙা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে মোড়ানো। চালার স্থানে স্থানে খড়কুটো উঠে ফুটো হয়ে গেছে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সেই ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতরে।

আম, কাঁঠাল, পাটিপাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। মাঝেমাঝে ছোট-বড় অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে অনেক আগে। দু-একটা খেজুরগাছও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। ছোট পুকুর। পুকুরে শিঙি কই আর মাগুর মাছের কমতি নেই। দিনরাত শব্দ করে ঘাই দেয় ওরা। পানিটাকে সারাক্ষণ ঘোলাটে করে রাখে। সামনে মাঝারি উঠোন। শীত কিংবা গ্রীষ্মে শুকিয়ে একরাশ ধুলো জমে। বর্ষায় একহাঁটু কাদা। কাদার ওপর ছোট ছোট ব্যাঙ এসে লাফিয়ে বেড়ায়। হাঁস কি মোরগে দেখলেই তাড়া করে ওদের। ধরে ধরে মারে। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে ওর অবস্থাটা কিছু ভালো।

মকবুল তিন বিয়ে করেছে। তিন বউই বেঁচে আছে ওর।

বড় বউ আমেনা কালো মোটা আর বেঁটে। বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছেছে এবার। ঘন ঘন কথা বলে। কথা বলার সময় পোকায়-খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিটিয়ে সামনের লোকগুলোকে ভিজিয়ে দেয়। পারিবারিক কলহ বাধলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দেখায়।

মেজো ফাতেমা। দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। বছরে তিনমাস পেটের অসুখে ভোগে। ছ-মাস বাপের বাড়িতে কাটায়। বয়সের হিসেবটা সে নিজেও জানে না। কেউ পনেরো বললেও সায় দেয়। পঁচিশ বললেও মেনে নেয়।

সবার ছোট টুনি। গায়ের রঙ কালো। ছিপছিপে দেহ। আয়ত চোখ। বয়স তার তেরো-চৌদ্দর মাঝামাঝি। সংসার কাকে বলে সে বোঝে না। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু ভুলে গিয়ে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

বুড়ো মকবুলের পরিবারের আরো একজন আছে।

নাম তার হীরন। ও তার বড় মেয়ে। বড় বউ-এর সন্তান। এবার দশ ছেড়ে এগারোয় পড়লো সে। এখন থেকে মকবুল ওর বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। দু-এক জায়গায় এর মধ্যে সম্বন্ধও পাঠিয়েছে সে।

বড়, মেজো আর ছোট—এই তিন বউ নিয়ে মকবুলের সংসার। তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা নেই ওর। আসলে বউদের আয় দিয়ে চলে ও। বড় দুই বউ দিব্যি আয় করে। বাজার থেকে পাতা কিনে এনে দিয়েই খালাস মকবুল। দুই বউ মিলে একদিনে তিন-চারটে চাটাই বুনে শেষ করে। মাঝেমাঝে টুনিও বসে পড়ে ওদের সঙ্গে। কাজ করে। চাটাইগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ দিয়ে পেঁয়াজ লঙ্কা আর পান সুপুরি কেনে মকবুল।

ফসলের দিন সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায়, তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও । বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির উপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয়। মকবুল নিজেও সঙ্গেসঙ্গে থাকে। মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর সিমের গাছ লাগায়। দু-বেলা জল ঢেলে গাছগুলোকে তাজা রাখে। সুখ আছে আবার সুখ নেইও মকবুলের জীবনে। তিন বউ যখন ঝগড়া বাধিয়ে চুল ছেঁড়ার লড়াই শুরু করে তখন বড় বিস্বাদ লাগে ওর। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তিনজনকে সমানে মারে সে। কাউকে ছাড়াছাড়ি নেই।

মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মার।

তার পাশেরটা আবুলের।

তার পাশে থাকে রশিদ।

পাশাপাশি তিনটে ঘর।

সবার দক্ষিণে যে ঘরটা সবার চেয়ে ছোট, ওটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছে ও জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে দশবছর বয়সে। লোকে বলে, মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো।

টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে।

আহা অমনটি আর হয় না।

ওপাশে আর কোনো ঘর নেই।

পশ্চিমের সারে, দক্ষিণের ঘরটা মনুর।

তার পাশে থাকে সুরত আলী।

তার পাশে গনু মোল্লা।

গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাতেও থাকে না, পাঁচেও না। জমিজমা নেই। চাষবাসের প্রশ্ন উঠে না। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তসবির ছড়াটা হতে থাকে তার। আপন মনে তসবি পড়ে।

দীঘিকে কেন্দ্র করে এই গ্রাম।

কখন কোন্ যুগে পত্তন ঘটেছিলো এ গ্রামের, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ বাড়ির পত্তন বেশিদিন আগে নয়। আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে।

সেই তেরশ' সনের বন্যা।

অমন বন্যা দু-চার জন্মে কেউ দেখেনি।

মাঠ ভাসালো, বাড়ি ভাসালো, ভাসলো কাজীর কুশান।

কিছু বাদ নেই। ঘর বাড়ি গোয়াল গরু সব। এমনকি মানুষ ভাসলো। জ্যান্ত মানুষ। মরা মানুষ।

তালগাছের ডগায় ঝোলানো বাবুইপাখির বাসায় কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিল পুঁটিমাছের ঝাঁক।

রহমতগঞ্জ কুলাউড়া নিজামপুর ভেসে সব একাকার হলো।

বুড়ো কাশেম শিকদার ছিলো কুলাউড়ার বাসিন্দা।

বুড়ো আর বুড়ি। ছেলেপিলে ছিলো না ওদের। মাটির নিচে পুঁতে-রাখা টাকা-ভরা কলসিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বানের জলে ভাসন দিলো বুড়ো আর বুড়ি।

কলাগাছের ভেলায় চারদিন চাররাত্রি। খাওয়া নেই দাওয়া নেই। একেবারে উপোস। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ভেলা ভাসছে আর ভাসছে।

অবশেষে এসে ঠেকল এ দীঘির পাড়ে।

লাল পরী, নীল পরী আর সবুজ পরীর দীঘি। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো উঁচু যার পাড়।

গ্রামটা পছন্দ হয়ে গেলো কাশেম শিকদারের।

কলসি থেকে টাকা বের করে দু-চার বিঘে জমি কিনে ফেলল সে। গোড়াপত্তন হলো এ বাড়ির।

বাড়ির চারপাশে আম কাঁঠাল সুপুরি আর নারিকেলের গাছ লাগালো কাশেম শিকদার। পুকুর কাটলো। ভিটে বাঁধলো। পছন্দমতো ঘর তুলল বড় করে। কিন্তু মনে কোনো শান্তি পেলো না সে। ছেলেপুলে নেই। মারা গেলে কে দেখবে এতবড় বাড়ি।

মাঝেমাঝে চিন্তায় এত বিভোর হয়ে যেতো যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকতো না তার। বুড়ি ছমিরন বিবি লক্ষ করতেন সব। বুঝতেন কেন স্বামীর মনে সুখ নেই, চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। মনে মনে তিনিও দুঃখ পেতেন।

তারপর, একদিন জলভরা-চোখে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ছমিরন বিবি। আস্তে করে বললেন, তুমি আর একডা নিকা করো। বলতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছিলো তাঁর। দু-গণ্ড বেয়ে অবিরাম পানি গড়িয়ে পড়ছিলো।

তবু স্বামীকে নিজ হাতে সাজিয়ে দিলেন ছমিরন বিবি। হাতে মেহেদি দিলেন। মাথায় পাগড়ি পরালেন। ঘরটা লেপেমুছে নিয়ে নিজ হাতে বিছানা পাতলেন স্বামী আর তার নতুন বিয়ে-করা বউ-এর জন্যে। আদর করে হাত ধরে এনে শোয়ালেন তাদের।

নতুন বউ-এর কাঁচা হলুদ ঝলসানো দেহের দিকে তাকাতে সাহস পেলেন না ছমিরন বিবি। ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে কে যেন তখন কলজেটা কুটিকুটি করে কাটছিল তাঁর। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি। পুকুরপাড়ে ধুতরা ফুলের সমারোহ। গুনে গুনে চারটে ফুল হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো মুখে পুরে দিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে পড়লেন। দীঘির পাড়ে উঁচু ঢিপির মতো তার কবরটা আজো চোখে পড়ে সবার আগে।

## ॥ দুই ॥

ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম শিকদার বাড়ি।

ঘুমে ঢুলুঢুলু বউ দুটোর গা বেয়ে দরদর ঘাম নামে। এতক্ষণে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। আঁচলটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে, সামনে হাত রাখার বাঁশের

ওপরে গুটিয়ে রেখেছে দুজনে। মাঝেমাঝে তুলে নিয়ে বুক আর গলার ঘাম মুছে নিচ্ছে। ঘামে কাপড়টা চপচপ করছে ওদের।

সেদিকে খেয়াল নেই মকবুলের। ও ভাবছে অন্য কথা।

বাড়ির ওপরের জমিটাতে লাঙল না দিলে নয়। অথচ হাল যে একটা ধার পাবে, সে সম্ভাবনা নেই। লাঙল অবশ্য যাহোক একটা আছে ওর। অভাব হলো গরুর। গরু না হলে লাঙল টানবে কিসে? আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়! মকবুল ভাবলো, বউ দুটোকে লাঙলে জুড়ে দিয়ে....দূর এটা ঠিক হবে না। লোকে গালাগাল দেবে ওকে। বলবে, দ্যাহো বউ দুইডা দিয়া লাঙ্গলও টানায়। তার চেয়ে এক কাজ করলে কি ভালো হয় না? না। বউদের দিয়েই লাঙল টানাবে সে। দিনে নয়, রাতে। বাইরের কোনো লোকে দেখবার কোনো ভয় থাকবে না তখন। বউরা অবশ্য আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ওসব পরোয়া করে না মকবুল। মুফতে বিয়ে করেনি সে। পুরো চার-চারটে টাকা মোহরানা দিয়ে একটা বিয়ে করেছে। হুঁ। ভাবছিলো আর সোনরঙ ধানগুলো ঢেঁকির নিচে ঠেলে দিচ্ছিলো মকবুল। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ করে হাতটা চেপে ধরলো সে। অসতর্ক মুহূর্তে ঢেঁকিটা হাতের ওপর এসে পড়েছে ওর। 'আল্লারে' বলে মুখটা বিকৃত করলো মকবুল।

টুনি আর আমেনা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ঢেঁকির উপর। ঘোর কাটতে ছুটে নেমে এলো ওরা। ওদের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ওদের গায়ের ওপরে থুতু ছিটিয়ে দিলো মকবুল। দূর-হ দূর-হ আমার কাছ থাইকা। বলতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চাপলো মকবুল।

আমেনা বললো, দ্যাহো কারবার, নিজের দোষে নিজে দুখ পাইলো আর এহন আমাগোরে গালি দেয়! আমরা কী করছি?

তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছস। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো মকবুল। তোরা দুই সতিনে ইচ্ছা কইরা আমার হাতে ঢেঁকি ফালাইছস। তোরা আমার দুশমন।

হ্যাঁ দুশমনই তো। দুশমন ছাড়া আর কী। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো আমেনা।

টুনি এগিয়ে গেলো ওর ফুলো হাতে ভিজা ন্যাকড়া বেঁধে দেয়ার জন্যে।

লাফিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলো মকবুল। দরকার নাই দরকার নাই। অত সোয়াগের দরকার নাই। বলে একখানা সরু কাঠের টুকরো নিয়ে ওর দিকে ছুড়ে মারলো মকবুল।

বিষ উঠছে নাহি বুড়ার? এমন করতাছে ক্যান। চাপা রোষে গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। খোলা বাতাসের নিচে এসে দাঁড়াতে ঠাণ্ডা বাতাসে দেহটা জুড়িয়ে গেলো ওর। হঠাৎ মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। উঠোন থেকে মন্তুর ঘরের দিকে তাকালো ও। একটা পিদিম জ্বলছে সেখানে। একবার চারপাশে দেখে নিয়ে মন্তুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো টুনি।

মাচাঙের ওপর থেকে কাঁথা-বালিশটা নামিয়ে নিয়ে শোবার আয়োজন করছিলো মন্তু।

টুনি দোরগোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে!

মন্তু মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে, ক্যান কী অইছে?

টুনি ফিসফিসিয়ে বলে, আজ যাইবা না?

মন্তু অবাক হয়, কই যামু?

টুনি মুখ কালো করে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপরে বলে, ক্যান, ভুইলা গেছ বুঝি?

মন্তুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। দেয়ালে ঝোলানো মাছ ধরার জালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, অ— মাছ ধরতে ?

যাইবা না ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে টুনি।

মন্তু হেসে বলে, যামু যামু। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে, বুড়া যদি টের পায় তাইলে কিন্তুক জানে মাইরা ফালাইবো ।

হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয় টুনি। মারেরে ডরাও নাকি ?

মন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, ভাত খাইছ ?

না। তুমি খাইছ ?

হুঁ। তুমি গিয়া খাইয়া আসো যাও। জলদি কইরা আইসো।

বিছানাটা আবার গুটিয়ে রেখে বেড়ার সঙ্গে ঝোলানো জালটা মাটিতে নামিয়ে নেয় মন্তু।

ও ঘর থেকে আমেনার ডাক শোনা যায়, টুনিবিবি কই গেলা, খাইতে আহো !

আহি, বলে সেখান থেকে চলে যায় টুনি।

আজকাল রাতের বেলা আমেনার ঘরে শোয় মকবুল। টুনি থাকে পাশের ঘরে। আগে, ফাতেমা আর ও—দুজনে একসঙ্গে থাকতো। মাসখানেক হলো ফাতেমা বাপের বাড়ি গেছে। এখন টুনি একা। রাতের বেলা ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ালেও ধরবার উপায় নেই।

রাত জেগে মাছ ধরাটা ইদানীং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে গ্রামের এ পুকুর থেকে অন্য পুকুরে জাল মেরে বেড়ায় ওরা। হাতে একটা টুকরি নিয়ে সঙ্গেসঙ্গে থাকে টুনি। জালে-ওঠা মাছগুলো ওর মধ্যে ভরে রাখে।

পর পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে সমস্ত সময় সজাগ থাকতে হয় ওদের। চারপাশে দৃষ্টি রাখতে হয়। একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলো দুজনে। জমির মুন্সীর বড় পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলো সেদিন। আকাশে চাঁদ ছিলো কিন্তু চাঁদনী ছিলো না। কালো মেঘে ছেয়ে ছিলো পুরো আকাশটা।

একহাঁটু পানিতে নেমে জালটাকে অতি সন্তর্পণে ছুড়ে দিয়েছিলো সে পুকুরের মাঝখানটাতে। শব্দ হয়নি মোটেও। কিন্তু পুকুরের পাড় থেকে জোরগলায় আওয়াজ শোনা গেলো, কে, কে জাল মারে পুকুরে ?

একহাঁটু পানি থেকে নীরবে একগলা পানিতে নেমে গেলো মন্তু। টুনি ততক্ষণে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

জমির মুন্সীর হাতের টর্চটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলো পুকুরের এপার থেকে ওপারে। মনে মনে বারবার খোদাকে ডাকছিলো মন্তু, খোদা তুমিই সব।

একটু পরে পাড়ের ওপর থেকে টুনির চাপা গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, এই উইঠা আহো। মুন্সী চইলা গেছে। বলে খিলখিল শব্দে হেসে উঠে সে।

ওর হাসির শব্দে রাগে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠেছে মন্তুর। এমন সময়ে মানুষ হাসতে পারে ?

তারপর থেকে, আরো সাবধান হয়ে গেছে মন্তু। গনু মোল্লার কাছ থেকে তিনআনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে সে। রাতে-বিরাতে গাঁয়ের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ানো, বিপদ-আপদ কখন কী ঘটে কিছু তো বলা যায় না। আগে থেকে সাবধান

হয়ে যাওয়া ভালো। সগন শেখের পুকুরপাড়ে এসে, বাজুর ওপরে বাঁধা তাবিজটাকে আজ একবার ভালো করে দেখে নিলো মন্তু। তারপর বুনোলতার ঝোপটাকে দু-হাতে সরিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলো সে। টুনি পেছন থেকে বললো, বারে, অত জোরে হাঁটলে আমি চলি কি কইরা?

মন্তু জালটাকে গুছিয়ে নিতে নিতে বললো, আস্তে আহো, তাড়া কিয়ের?

টুনি বলে, বারে আমার বুঝি ডর-ভয় কিছু নাই। যদি সাপে কামড়ায়?

সাপের কথা বলতে না-বলতেই হঠাৎ একটা আঁধি সাপ ফোঁস করে উঠে সরে যায় সামনে থেকে। আঁতকে উঠে দু-হাত পিছিয়ে আসে মন্তু। ভয় কেটে গেলে থু-থু করে বুকের মধ্যে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দেয় সে। পেছনে টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, বুকে থুক দাও তাইলে কিচ্ছু অইবো না।

কোনোরকম বিতর্কে না এসে নীরবে ওর কথা মেনে নেয় টুনি। কপালটা আজ মন্দ ওদের। অনেক পুকুর ঘুরেও কিছু চিংড়ি-গুঁড়ো ছাড়া আর কিছুই জুটলো না। মাছগুলো আজকাল কেমন যেন সেয়ানা হয়ে গেছে। পুকুরের ধারেকাছে থাকে না। থাকে গিয়ে একেবারে মাঝখানটিতে, অতদূর জাল উড়িয়ে নেয়া যায় না।

টুনি বলে, থাউক, আইজ থাউক। চলো বাড়ি ফিইরা যাই।

জালটাকে ধুয়ে নিয়ে মন্তু আস্তে বলে, চলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুলো হাতটা কোলে নিয়ে বসে বসে আবুল আর হালিমার ঝগড়া দেখছিলো মকবুল।

অনেকক্ষণ কী একটি বিষয় নিয়ে তর্ক চলছে ওদের মধ্যে। দাওয়ায় বসে যা মুখে আসছে ওকে বলে যাচ্ছে আবুল। হালিমাও একেবারে চুপ করে নেই। উঠোনে একটা লাউয়ের মাচা বাঁধতে বাঁধতে দু-একটা জবাবও দিচ্ছে সে মাঝেমাঝে।

মকবুল হাতের ব্যথায় মৃদু কাতরাচ্ছিলো আর পিটপিট চোখে তাকাচ্ছিলো ওদের দিকে।

হঠাৎ দাওয়া থেকে ছুটে এসে মুহূর্তে হালিমার চুলের গোছা চেপে ধরলো আবুল। তারপর কোনো চিন্তা না করে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিলো ওর তলপেটে। উহ্ মাগো, বলে পেটটা দু-হাতে চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়লো হালিমা। রাগে তখন ফোঁপাচ্ছে আবুল, আমার ঘরের ভাত মাংস ধ্বংস কইরা রাস্তার মানুষের লগে পিরীত। জানে খতম কইরা দিমু না তোরে। কাইটা রাস্তায় ভাসায় দিমু না। বলে আবার ওর চুলের গোছাতে হাত দিতে যাচ্ছিল আবুল, বুড়ো মকবুল চিৎকার করে উঠলো, খবরদার আবুইল্যা, তুই যদি বউ-এর গায়ে আরেকবার হাত তুলছস তাইলে ভালো অইবো না কিন্তুক।

আমার ঘরনীর গায়ে আমি হাত তুলি কি যা-ইচ্ছা করি, কইবার কে আঁ? পরক্ষণে আবুল জবাব দিলো, তুমি যহন তোমার ঘরনীরে তুলাপেডা করো তহন কি আমরা বাধা দিই।

অমন কোণঠাসা উত্তরের পর আর কিছু বলার থাকে না মকবুলের। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একনজর ওর দিকে তাকালো মকবুল। আবুল তখন ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে চলেছে হালিমাকে। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঝাঁপি বন্ধ করে মনের সুখে মারবে। ওর ইচ্ছেটা হয়তো বুঝতে পেরেছিলো হালিমা। তাই মাটি আঁকড়ে ধরে গোঙাতে লাগলো সে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি। আর মাইরো না, মইরা যামু।

চুপ, চুপ। তীব্র গলায় ওকে শাসিয়ে ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেয় আবুল। হেঁচকা টানে ওর পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা খুলে নিয়ে ঘরের এককোণে ছুড়ে ফেলে দেয় সে। তালি-দেওয়া পুরানো ব্লাউজটা আঁটসাঁট করে বাঁধা ছিলো, টেনে খুলে ফেলে আবুল। তারপর দু-পায়ে নগ্ন দেহটাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়াতে থাকে সে।

বেড়ার সঙ্গে পুরানো একটা ছড়ি ঝোলানো ছিলো। সেটা এনে হালিমার নরম তুলতুলে কপালে কয়েকটা আঁচড় টেনে দেয় আবুল। এইবার পিরীত করো। আরো পিরীত করো রাস্তার মানুষের লগে।

আহহারে ! এ্যারে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইন্যা দরজা খোল্, মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দু-হাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকালো সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুললো না।

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। পান-বিড়ির মতো এও যেন একটা নেশা হয়ে গেছে ওর। মেরে মেরে এর আগে দু-দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।

প্রথম বউটা ছিল এ গাঁয়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে, একটু মোটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিলো মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত মেরেছে ওকে আবুল। কোনোদিন একটু শব্দও করেনি। পিঠটা বিছিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে চুপচাপ বসে থাকতো। কিল, চাপড়, ঘুসি ইচ্ছেমতো মারতো আবুল।

একটা সামান্য প্রতিবাদ নেই।

প্রতিরোধ নেই।

শুধু, আড়ালে চোখের পানি ফেলতো মেয়েটা।

তারপর একদিন ভীষণভাবে রক্তবমি শুরু হলো ওর। জমাট-বাঁধা কালো কালো রক্ত। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মারা গেলো আয়েশা।

আয়েশা টিকেছিলো বছর তিনেক। তার পরেরটা কিন্তু ওর চাইতেও কম। মাত্র দু-বছর।

অবশ্য জমিলার মাত্র দু-বছর টিকে থাকার পেছনে একটা কারণও আছে। ও মেয়েটা ছিলো একটু বাচাল গোছের আর একটু রুক্ষ মেজাজের। সহজে আবুলের কিল-চাপড়গুলো গ্রহণ করতে রাজি হতো না সে। মারতে এলে কোমরে আঁচল বেঁধে রুখে দাঁড়াতো।

হাজার হোক মেয়ে তো। পুরুষের সঙ্গে পারবে কেন ? বাধা দিতে গিয়ে আরো বেশি পরিমাণে মার খেতো জমিলা। ও যখন মারা গেলো আর ওর মৃতদেহটা যখন গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছিলো সবাই, তখন ওর সাদা ধবধবে পিঠের উপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফুলে-ওঠা রেখাগুলো দেখে শিউরে উঠেছিলো অনেকে। ওরে পাষাইন্যারে এমন দুধের মতো মাইয়াটারে শেষ করলি তুই।

আয়েশা মারা যাবার পর অবশ্য ভীষণ কেঁদেছিলো আবুল। গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিলো সারা উঠোনে। পাড়াপড়শিদের বলেছিলো, আহা বড় ভালো আছিলো আয়েশা। আমি পাষাইন্যা তার কদর বুঝলাম না। আহারে এমন বউ আর পামু না জীবনে।

আয়েশার শোকে তিনদিন একফোঁটা দানাপানিও মুখে পোরেনি আবুল। তিনরাত কাটিয়েছে ওর কবরের পাশে বসে আর শুয়ে। পাড়াপড়শিরা ভেবেছিলো ওর চরিত্রে বুঝি পরিবর্তন এলো এবার। এবার ভালো দেখে একটা বিয়েশাদি করিয়ে দিলে সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করবে আবুল।

কিন্তু জমিলার সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করছে আবুল। একই পরিণাম ঘটেছে জমিলার জীবনেও।

দ্বিতীয় বউ-এর মৃত্যুতে আবুলের গড়াগড়ি দিয়ে কান্নার কোনো মূল্য দেয়নি পড়শিরা। মুখে বিরক্তি এনে বলেছে, আর অত ঢঙ করিস না আবুইল্যা। তোর ঢঙ দেইখলে গা জ্বালা করে।

আমার বউ–এর দুঃখে আমি কাঁদি, তোমাগো জ্বালা করে ক্যান ? ওদের কথা শুনে খেপে ওঠে আবুল। কপালে একমুঠো ধুলো ছুঁইয়ে সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে সে, এই তৌবা করলাম, বিয়াশাদি আর করমু না। খোদা, আমারে আর বিয়ার মুখ দেখাইও না। খোদা, আমার শত্রুরা আরামে থাহুক। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আবুল।

পড়শিরা গালে হাত দিয়ে বলেছে, ইয়া আল্লা, এই কেমনতরো কথা। বউ মারলি তুই, সেই কথা বইলা কি শত্রুতামি করলাম নাকি আমরা ? সাচা কথা কইলেই তো মানুষ শত্রু হয়।

ঠিক কইছ বঁইচির মা, সাচা কথা কইলেই এমন হয়। তা, আমাগো কইবারও যা দরকার কী। ওর বউরে মারুক কি কাটুক, কি নদীতে ভাসায়া দিক, আমাগো কি তাতে।

সেদিন থেকে আবুলের সাতে–পাঁচে আর কেউ নেই ওরা।

আজকাল হালিমাকে যখন প্রহর–অন্তর একবার করে মারে আবুল তখন কেউ কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। মাঝেমাঝে বুড়ো মকবুল এক–আধটু বাধা দেবার চেষ্টা করে। আবুইল্যা, তোর কি মানুষের পরাণ না, এমন কইরা যে মারছ বউডারে তোর মনে এতটুকুও চোট লাগে না আবুইল্যা ?

বউদের অবশ্য মকবুলও মারে। তাই বলে আবুলের মতো অত নির্দয় হওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না সে। মারবি তো মার, একটুখানি সইয়া মার। অপরাধের গুরুত্ব দেইখা সেই পরিমাণ মার। এ হলো মকবুলের নিজস্ব অভিমত।

অপরাধ, এমন কোনো সাংঘাতিক করেনি হালিমা। পাশের বাড়ির নূরুর সঙ্গে কী একটা কথা বলতে গিয়ে হেসেছিলো জোরে। দূর থেকে সেটা দেখে গা–জ্বালা করে উঠেছে আবুলের। একটা গভীর সন্দেহে ভরে উঠেছে মন। এমন খোলা হাসি তো আবুলের সঙ্গে কোনোদিন হাসেনি হালিমা।

বেহুঁশ হালিমাকে ভেতরে ফেলে রেখে আবুল যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত নেমেছে ওর। পরনের লুঙি দিয়ে গায়ের ঘামটা মুছে নিয়ে দাওয়ার ওপর দম ধরে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলো আবুল। মাটির হুঁকোটাকে নেড়েচেড়ে কী যেন দেখলো, তারপর কলকেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রশীদের বউ সালেহা উঠোনে বসে চাটাই বুনছিলো। আবুলকে এদিকে আসতে দেখে মুখ টিপে হেসে বললো, বউ-এর পিরীত বুঝি আর সইলো না মিয়ার।

আর সইবো, বহুত সইছি। মুখ বিকৃত করে পুরনো কথাটাই আবার বলে গেলো আবুল, আমার ঘরের ভাত খাইয়া রাস্তার মানুষের সঙ্গে পিরীত। তুমি কও ভাবী, এইডা কি সহ্য করন যায় ?

হ্যাঁ, তাতো খাঁটি কথাই কইছ। সালেহা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ঘরনী যদি মনের মতো না হয় তাইলে কি তারে নিয়া আর সুখে ঘর করন যায় ?

আর ভাবী, দুনিয়াদারি আর ভালো লাগে না। ইচ্ছা করে দুই চোখ যেইদিকে যায় চইলা যাই। বলে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল। তারপর কলকেটা সালেহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, চুলায় আগুন আছে ? একটুখানি আগুন দাও।

এই দিই, বলে কলকেটা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলো সালেহা। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলো সে। ও কাছে আসতে গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে এনে আবুল বললো, আইজ আর ছাড়ি নাই ভাবী। যতক্ষণ পারছি মারছি। তুমি একটু তেল গরম কইরা দিও ওর গায়ে। হাড্ডি না দুই-একখান ভাইঙ্গা গেছে কে জানে। তাইলে তো বড় বিপদ অইবো। কামকাজ কত পইর‍্যা রইছে। সবকিছু বন্ধ অইয়া যাইবো।

সেই কথা কি আগে খেয়াল আছিলো না মিয়ার ? সালেহা মুখ বাঁকালো। কামকাজের যখন ক্ষতি অইবো জানো, তহন না মারলেই পাইরতা। মারলা ক্যান।

উহুঁ, আবুল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, মারছি ঠিক করছি, না মারলে আস্কারা পাইয়া যাইতো।

আর আস্কারা কি এমনে কম পাইছে ? চারদিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে সালেহা বললো, নূরুর সঙ্গে কি আজকা কথা কইছে ? ও তো রোজ কথা কয়।

কী ! চোখজোড়া আবার ধপ করে জ্বলে উঠলো আবুলের, আমারে এতদিন কও নাই ক্যান ?

সালেহা বললো, কী দরকার বাপু আমাগো মিছামিছি শত্রু বইনা। কইতাম গেলে তো অনেক কথাই কইতে হয়। তাকি আর একদিনে শেষ করা যায়।

কী কথা, কও ভাবী। খোদার কসম ঠিক কইরা কও। তামাক খাওয়াটা একেবারে ভুলে গেলো আবুল।

সালেহা আস্তে করে বললো, যাই কও বাপু কারো বদনাম করার অভ্যাসই আমার নাই। কিন্তুক কই কি এই বউডা তোমার বড় ভালো অয় নাই। আমরা তো আয়শারেও দেখছি, জমিলারেও দেখছি। ওরাতো আমাগো হাতের ওপর দিয়াই গেছে। চরিত্রে ওগো তুলনা আছিলো না। কিন্তুক হালিমার স্বভাব-চরিত্র বাপু আমার বড় ভালো লাগে না। বলতে গিয়ে বারকয়েক কাশলো সালেহা। কাশটা গিলে নিয়ে আবার সে বললো, ইয়ে মানে, বাইরের মানষের সঙ্গে হাসাহাসি আর ঢলাঢলি। একটুহানি লজ্জা-শরমও তো থাকা চাই।

কথা শেষে আবুলের রক্তলাল চোখজোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো সালেহা। একটু ধমকের সুরে বললো, দেইখো বাপু, তুমি আবার মাইয়াডারে মারতে শুরু কইরো না। এমনিতে বহুত মারছ। এতে যদি শিক্ষা না হয় তাইলে আর এ জন্মেও হইবো না।

সালেহার কথাটা শেষ হবার আগেই সেখান থেকে চলে গেছে আবুল। কলকেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে সে। একটু পরে আবার হালিমার কান্নার শব্দ শোনা গেল ঘর থেকে। আবুল আবার মারছে তাকে।

## ॥ তিন ॥

এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলো টুনি।

এত শিঘ্রী উঠতো না সে, বুড়ো মকবুলের ধমক খেয়ে শুয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে করলো না। মনে মনে বুড়োকে একহাজার একশো অভিশাপ দিলো। চোখজোড়া জ্বালা করছে তার। মাথাটা ঘুরছে। সারা দেহে বিশ্রী এক অবসাদ। ছড়ানো শাড়িটা চাটাইয়ের ওপর থেকে গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো টুনি। ঘরের পাশে ছাইয়ের গাদা থেকে একটা

পোড়া কাঠের কয়লা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পুকুরের দিকে চলে গেলো। একগলা পানিতে নেমে মন্তু গোছল করছে পুকুরে।

ঘোলাটে পানি আরো ঘোলা হয়ে গেছে।

কতকগুলো হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করে সাঁতার কাটছে এপার থেকে ওপারে, আর মাঝে মাঝে মুখটা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে চ্যাপটা ঠোঁট দিয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

কাঁঠালগাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ঘাটের এককোণে এসে নীরবে দাঁতন করতে বসলো টুনি। পা-জোড়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে একমনে দাঁতন করতে করতে হঠাৎ তার নজরে এলো মন্তুর পিঠের ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। মনে হলো কিছুক্ষণ আগেই বুঝি কিছুর সঙ্গে লেগে চিরে গেছে পিঠটা। ওমা, বলে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিলো টুনি, এই এই শোনো।

মন্তু ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, কী, কী হইছে?

এই দিকে আহো না, আহো না এইদিকে।

কাছে আসতে ওর পিঠটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে বললো, এইখানটা চিরলো কেমন কইরা, আঁ?

মন্তু হেসে দিয়ে বললো, গতকাল রাতে সগন শেখের পুকুরপাড়ে একটা বুনোলতার কাঁটা লাগছিলো পিঠে।

টুনির চোখজোড়া মুহূর্তে করুণ হয়ে এলো। দরদ-ভরা কণ্ঠে সে আস্তে করে বললো, চলো কচুপাতার ক্ষির লাগাইয়া বাইন্দা দি, নইলে পাইকা যাইবো, শেষে কষ্ট পাইবা।

মন্তু আবার একগলা পানিতে নেমে যেতে যেতে বললো, দূর কিছু অইবো না আমার।

টুনি কিছু বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ মকবুলের উঁচু গলার ডাকে ওর কথার ছেদ পড়লো।

কই টুনি বিবি, বলি বিবিজানের মুখ ধোয়ন কি এহনো অইলো না নাকি।

রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে বুড়ো মকবুল। কাল রাতে যে ধানগুলো ভানা হয়নি সেগুলো ভানতে হবে এখন। হাত ভেঙে ফুলে গেলেও সহজে বসে থাকার পাত্র নয় মকবুল।

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে বুড়োর মৃত্যু কামনা করতে করতে ঘাট থেকে উঠে গেলো টুনি।

মন্তুর কোনো জমিজমা নেই।

পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙল চষে। ধান বোনে। আবার সে ধান পাকলে পরে কেটে এনে মালিকের গোলা ভর্তি করে। তারপর ধানের মরশুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল, সরিষার ক্ষেতে কাজ করে মন্তু। মাঝেমাঝে এ-বাড়ি ও-বাড়ি লাকড়ি কাটার চুক্তি নেয়। পাঁচ মণ এক টাকা। কোনো কোনো দিন আট-নয় মণ লাকড়িও কেটে ফেলে সে। মাঝে কিছুকাল মাঝি-বাড়ির নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখের সঙ্গে নৌকা বেয়েছিলো মন্তু। নৌকায় পাল তুলে দিয়ে অনেক দূরের গঞ্জে চলে যেতো ওরা। ওখান থেকে যাত্রী কিম্বা মাল নিয়ে ফিরতো। ক্ষেতের রোজগারের চেয়ে নৌকায় রোজগার অনেক বেশি।

মাচাঙের উপর থেকে আধ-ময়লা ফতুয়াটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে-দিতে মন্তু ভাবলো, আজ একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করবে গিয়ে। তখন সন্ধ্যার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে। মিয়া-বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে

আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে তসবি হাতে নামাজ পড়তে চলছেন গনু মোল্লা। মোরগ-হাঁসগুলো সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর এখন উঠোনের এককোণে এসে জটলা বেঁধেছে। একটু পরে যার-যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে ওরা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো মন্তু।

মাঝি-বাড়িটা দূরে নয়।

সগন শেখের পুকুরটাকে বাঁ দিকে রেখে ডানদিকে মিয়াদের খেজুরবাগানটা পেরিয়ে গেলে, দুটো ক্ষেত পরে মাঝি-বাড়ি। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে নন্তু শেখের গরু-ঘরের পেছন থেকে একটা লোম-ওঠা হাড়-বের-করা কালো কুকুর দৌড়ে এসে বিকট চিৎকার জুড়ে দিলো। হেই হেই করে কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলো সে।

দেউড়ির সামনে বাঁশের উপরে ঝুলিয়ে-রাখা সুপুরি-পাতার ঝালরের আড়াল থেকে একটা গানের কলি গুনগুন করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এলো আম্বিয়া।

আরে মন্তু ভাই দেহি। কী খবর ?

মন্ত বললো, করিম আছে নাহি ?

মাথার চুলগুলো খোঁপার মধ্যে গুটিয়ে নিতে-নিতে আম্বিয়া বললো, আছে। আইজ কয়দিন থাইকা জ্বর অইছে ভাইজানের।

কী জ্বর ? কহন অইছে ? মন্তুর চোখে উৎকণ্ঠা।

আম্বিয়া আস্তে করে বললো, পরশু রাত থাইকা অইছে। কী জ্বর তা কইবার পারলাম না।

হুঁ। মন্তু কী যেন চিন্তা করলো। তারপর ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতে আম্বিয়া পেছন থেকে ডাকলো, চইল্যা যাও ক্যান। দেখা কইরা যাইবা না ?

আম্বিয়ার পিছুপিছু হোগলার বেড়া-দেয়া ঘরটার এসে ঢুকলো মন্তু। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে ম্লান হেসে করিম বললো, মন্তু মিয়া যে, তোমারে তো আইজকাল দেখাই যায় না। বাঁইচা আছি কি মইরা গেছি তাও তো খোঁজখবর নাও না মিয়া।

মন্তু প্রথমে বিব্রত বোধ করলো, তারপর বললো, দেখা না অইলে কী অইবো মিয়া, খোঁজখবর ঠিকই নিই।

কলকেতে তামাক সাজিয়ে এনে হুঁকোটা মন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিলো আম্বিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করলো, পান খাইবা ? মন্তু হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বললো, না থাউক। আপন মনে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো সে। তারপর আসল কথাটা আলোচনা করলো ওর সঙ্গে। করিম শেখের সঙ্গে আবার কিছুদিনের জন্যে নৌকার কাজ করতে চায় মন্তু।

শুনে খুশি হলো করিম। বললো, নাওটারে একটু মেরামত করন লাগবো। কাল-পরশু একবার আইসো।

আবার আসবে বলে উঠতে যাচ্ছিলো মন্তু।

করিম সঙ্গেসঙ্গে বললো, আহা যাও কই, বহ না।

না। রাইত অইছে যাই এইবার।

আম্বিয়া বললো, বহ বহ মন্তু ভাই, চাইরডা ভাত খাইয়া যাও।

এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা পাল্‌টে একটা নীলরঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে আম্বিয়া। মুখখানা গামছা দিয়ে মুছে এসেছে সে।

কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু। আঁটসাঁট দেহের খাঁজে খাঁজে দুরন্ত যৌবন, আটহাত শাড়ির বাঁধন ভেঙে ফেটে পড়তে চায়। ওকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করলো আম্বিয়া, দাঁড়াইয়া রইলা ক্যান, বহ না।

মন্তু বললো, না আইজ না। আর একদিন আমু। বলে বাইরে বেরিয়ে এলো মন্তু।

পিদিম হাতে দেউড়ি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে গেলো আম্বিয়া। মন্তু শুধালো, তোমার আব্বা কই গেছে?

আম্বিয়া বললো, যেই কাজ কইরা বেড়ায় সেই কাজ করতে গেছে। যাইবো আবার কই। ওর গলায় ক্ষোভ।

ওর মুখের দিকে একনজর তাকালো মন্তু। ওর ক্ষোভের কারণটা সহজে বুঝতে পারলো। সাত গ্রামের মরা মানুষকে কবর দিয়ে বেড়ায় নন্তু শেখ। আশেপাশের গ্রামে গত ত্রিশবছর ধরে যত লোক মরেছে সবার কবর খুঁড়েছে নন্তু শেখ। এ তার পেশা নয়, নেশা।

আম্বিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নেমে এলো মন্তু তখন সে অনুভব করলো বেশ রাত হয়েছে।

চারপাশে ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝেমাঝে গাছের মাথায় দু-একটা পাখি হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে।

বাড়ির কাছে এসে পৌছতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এলো মন্তুর।

কইন্যা দেইখা গাজী মিয়ার চমক ভাঙিলো।
কইন্যার রূপেতে গাজী বেহুঁশ হইল।

উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটির চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে একটা পিদিমের আলোতে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত। পুরুষরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরও দূরে। দাওয়ার ওপরে।

বুড়ো মকবুল গুড়ুক গুড়ুক হুঁকো টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুঁথি পড়ার। বড় সুন্দর পুঁথি পড়ে সুরত আলী। এ গাঁয়ের সেরা পুঁথি-পড়ুয়া সে।

আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাসে অতিধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোনো সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরেধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজী কালুর পুঁথি, ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।

শুন শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন ॥
কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ ॥
আকাশে চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূপের পরী ॥

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবোয়। মাঝেমাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিচ্ছা বর্ণনা করে সবার কাছে। কিচ্ছা নয়, একেবারে সত্য

ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিল কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাকঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সঙ্গে।

বড় সুখে দিন কাটছিল ওদের।

একবছর পরে একটা দুধের মতো মেয়ে জন্ম নিলো ওদের।

আট বেহারার পাল্‌কি চড়ে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লালপরী নীলপরী আর সবুজ পরীর দীঘির পাড় দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলো কমলা।

দীঘি দেখে পাল্‌কি থেকে নামলো সে। চৈত্রমাসের খর রোদে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিলো ওর। দীঘির স্বচ্ছ পানি দেখে বড় লোভ হলো কমলার। পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আঁচল ভরে পানি খেলো সে। তারপর যখন উঠতে যাবে, দেখলো চুলের মতো সরু কী যেন একটা কড়ে আঙুলের গোড়ায় আটকে রয়েছে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গেলো। পারলো না কমলা। যত টানে তত লম্বা হয় সে চুল। তার একপ্রান্ত পানির ভেতরে, অন্যপ্রান্ত কড়ে আঙুলের সঙ্গে গিঁটআঁটা। ছাড়াতেও পারে না কমলা, এগুতেও পারে না। এগুতে গেলে পানির ভেতর চুলে টান পড়ে। কে যেন টেনে ধরে রেখেছে ওটা।

চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেলো।

কত লোক এলো। কত লোক গেলো।

কত কামার কুমার ওঝা এসে জড়ো হলো। কেউ কিছু করতে পারলো না। ইস্পাতে তৈরি কুড়োল দিয়েও কাটা গেলো না চুলটা। তিনমাস তিনদিন চলে গেলো।

তারপরে এক রাতে স্বপ্নে দেখিলো সুন্দরী।
দীঘির পানিতে আছে এক রাজপুরী ॥
সেইখানে আছে এক রাজপুত্র সুন্দর।
আশেক হইয়াছে তার কমলার উপর ॥
কমলারে পাইতে চায় আপন করিয়া।
কমলার লাইগা তার কাঁন্দিছে হিয়া ॥—

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে গেলো কমলার। কাঁদলো সবাই। বাবা, মা। স্বামী সবাই।

দীঘির পানি থেকে চুলে টান পড়লো এতদিনে। পাতা পানি থেকে হাঁটু পানিতে নেমে গেলো কমলা। হাঁটু থেকে বুক। তারপর গলা। ধীরেধীরে দীঘির পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কমলা সুন্দরী।

চাঁদ হেলে পড়ে পুব থেকে পশ্চিমে।
ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।
ঢুলে ঢুলে পুঁথি পড়া শেষ করে সুরত আলী।
হীন মোয়াজ্জেমে কহেরে শুন সর্বজন।
কমলা সুন্দরীর কিচ্ছা হইল সমাপন ॥
ভুল চুক হইলে মোরে লইবেন ক্ষেমিয়া।
দোয়া করিবেন মোরে অধীন জানিয়া ॥

পুঁথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেক আফসোস করে মেয়ে বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখজোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কি না করতে পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্যে হুঁকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কী যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

## ॥ চার ॥

খড়ম-জোড়া তুলে নিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে পুকুরঘাটে চলে যায় মন্তু। অজু করে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আজ।

মাঝি-বাড়ি থেকে ধপাস ধপাস ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

রাত জেগে আজও ধান ভানছে আম্বিয়া। বড় মিহি কণ্ঠস্বর ওর, বড় সুন্দর গান গায় সে।

ভাটুইরে না দিও শাড়ি,
ভাটুই যাবে বাপের বাড়ি।
সর্ব লইক্ষণ কাম চিক্কণ,
পঞ্চ রঙের ভাটুইরে ॥

পুকুরঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়লো মন্তু। ছোট পুকুরের পূর্বপাড় থেকে কে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমপাড়ের দিকে। আবছা আলোতে সবকিছু স্পষ্ট না দেখলেও মেয়েটিকে চিনতে ভুল হলো না মন্তুর। আবুলের বউ হালিমা। এত রাতে একা-একা কোথায় যাচ্ছে সে।

পশ্চিমপাড়ের লম্বা পেয়ারাগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো মেয়েটা। চারপাশে বার-কয়েক ফিরে তাকালো সে। তারপর ধীরেধীরে পরনের ছেঁড়া কাপড়টা খুলে ফেললো সে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মন্তু। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর।

পরনের কাপড়টা খুলে তার একটা প্রান্ত পেয়ারাগাছের মোটা ডালটার সঙ্গে বাঁধলো হালিমা। আরেকটা প্রান্ত নিজের গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে কী যেন পরখ করলো সে।

মন্তুর আর বুঝতে বাকি রইলো না, গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে চায় হালিমা। এ দুনিয়াটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে। তাই আর বাঁচতে চায় না ও।

মন্তু এ মুহূর্তে কী করবে ভেবে উঠতে পারছিলো না।

হঠাৎ ওকে অবাক করে দিয়ে গলার ফাঁসটা খুলে ফেলে আপন মনে কেঁদে উঠলো হালিমা। পেয়ারাগাছটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।

হয়তো, বাবা-মা'র কথা মনে পড়েছে ওর। কিম্বা, দুনিয়াটা অতি নির্মম হলেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না হয়তো।

এরমধ্যে বার চারেক গলায় ফাঁস পরেছে আর খুলেছে হালিমা। ওর অবস্থা দেখে অতি দুঃখেও হাসি পেলো মন্তুর। ধীরেধীরে ওর খুব কাছে এগিয়ে গেলো সে। তারপর অকস্মাৎ ওর একখানা হাত চেপে ধরলো মন্তু।

একটা করুণ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো হালিমা। বড় বিষণ্ন চাহনি ওর। অনেকক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলো দুজন। ঈষৎ চাঁদের আলোয় মন্তু দেখলো, হালিমার নাক আর চোখ দুটো অসম্ভব রকম ফুলে গেছে। এত মার মেরেছে ওকে আবুল।

মন্তু শিউরে উঠলো। তারপর কী বলতে যাচ্ছিলো সে। হঠাৎ একঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চাপা কান্নার সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলো হালিমা। বোবা দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু।

পুকুরপাড় থেকে ফিরে এসে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে। চেয়ে দেখে, ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথির কথাগুলো গুনগুন করছে টুনি।

দাওয়া থেকে নেমে এসে টুনি শুধালো, কোথায় গিছলা মিয়া ? তোমারে আমি খুঁইজা মরি।

শোবার ঘর থেকে মকবুল আর আমেনার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। রশীদ আর সালেহাও বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী নিয়ে যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

সুরত আলীর ঘরের সবাই শুয়ে পড়েছে।

আবুল আর হালিমার ঘরেও কোনো বাতি নেই।

মন্তু সহসা টুনির কথার কোনো জবাব দিলো না।

টুনি আরো কাছে এগিয়ে এসে বললো, এহনি ঘুমাইবা বুঝি ?

মন্তু বললো, হুঁ। শরীরটা আইজ ভালো নাই !

ক্যান, কী অইছে ? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। জ্বর হয় নাই তো ?

মন্তু বললো, না, এমনি খারাপ লাগতাছে।

টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে করে বললো, আইজ শাপলা তুলতে যাইবা না ?

মন্তু বললো, আইজ থাক, কালকা যামু।

টুনি কী যেন ভাবলো। ভেবে বললো, পরশু দিনকা আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।

তাই নাহি ?

হুঁ। বাবজানের অসুখ, তাই।

অসুখের কথা কার কাছ থাইকা শুনলা ? ওর মুখের দিকে তাকালো মন্তু।

টুনি আস্তে করে বললো, বাবজানে লোক পাঠাইছিলো।

অ। উঠোনের মাঝখানে দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে মন্তু নীরবতা ভাঙলো, পরশু থাইকা আমিও নাও বাইতে যাইতাছি।

কোন্‌হানে যাইবা ? টুনি সোৎসাহে তাকালো ওর দিকে।

মন্তু বললো, কোন্‌হানে যাই ঠিক নাই। করিম শেখের নাও। সে যেইহানে নিয়া যায় সেইহানেই যামু।

টুনি বললো, তোমার নায়ে আমার বাপের বাড়ি পৌঁছায়া দিবা ?

বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।

সহসা কোনো জবাব দিতে পারে না মন্তু। তারপর ইতস্তত করে বলে, অনেক রাত অইছে এইবার ঘুমাও গিয়া। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মন্তু।

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙলো মন্তুর।

বাইরে উঠোনে তখন কী একটা বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়েছে আমেনা আর সালেহা। অকথ্য ভাষায় পরস্পরকে গালাগাল দিচ্ছে ওরা। গনু মোল্লার ঘরের সামনে একটা বড় রকমের ভিড়।

গ্রামের অনেক ছেলে-বুড়ো এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। ব্যাপারটা কী প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলো না মন্তু। পরে বুড়ো মকবুলের মেয়ে হীরনের কাছ থেকে শুনলো সব।

মজু ব্যাপারীর মেজো মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়াবার জন্য ওকে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে সবাই। ব্যাপারীর ছোটভাইকে সামনে পেয়ে মন্তু শুধালো, কি মিয়া ভূতে পাইল কহন অ্যাঁ ? ব্যাপারীর ভাই আদ্যোপান্ত জানালো সব।

কাল ভোর সকালে পরীর দীঘির পাশে শুকনো ডালপাতা কুড়োতে গিয়েছিলো মেয়েটা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, মেয়ে আর ফেরে না। ওদিকে মেয়ের মা তো ভেবেই আকুল। বয়স্কা মেয়ে কে জানে আবার কোন্ বিপদে পড়লো। প্রথমে ওকে দেখলো কাজীবাড়ির থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তেঁতুলগাছের মগডালে উঠে দু-পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়ি তো অবাক, বলি লজ্জা-শরমের কি মাথা খাইছ ? দিনদুপুরে গাছে উইঠ্যা পিরীতের গীত গাইবার লাগছ। ও মাইয়া, বলি লজ্জা-শরম কি সব উইঠ্যা গেছে নাহি দুনিয়ার উপর থাইক্যা ?

বুড়ি যত চিৎকার করে মরে, মেয়ে তত শব্দ করে হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না।

খবর শুনে মজু ব্যাপারী নিজে ছুটে এলো দীঘির পাড়ে। নিচে থেকে মেয়ের নাম ধরে বারবার ডাকলো সে। সখিনা, মা আমার, নাক-কান কাটিছ না মা, নাইম্যা আয়।

বাবাকে দেখে ওর গায়ের ওপরে থুতু ছিটিয়ে দিলো সখিনা। তারপর খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বললো, আর যামু না আমি। এইখানে থাকুম।

ওমা কয় কী! মাইয়্যা আমার এই কী কথা কয় ? মেয়ের কথা শুনে চোখ উলটে গেলো মজু ব্যাপারীর।

থুরথুরে বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। সহসা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ালো সে, লক্ষণ বড় ভালো না ব্যাপারী। মাইয়ারে তোমার ভূতে পাইছে।

খবরদার বুড়ি বাজে কথা কইস না। উপর থেকে সঙ্গেসঙ্গে প্রতিবাদ জানালো সখিনা। বেশি বকবক করলে ঘাড় মটকায়া দিমু।

এ কথার পরে কারো সন্দেহের আর অবকাশ রইলো না।

বুড়ি বললো, এ বড় ভালো লক্ষণ নয়, জলদি কইরা লোকজন ডাহ।

লোকজন ডাকার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কারণ হাঁকডাক শুনে ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। বুড়ো ছমির মিয়া বললো, দাঁড়ায় তামাশা দেখতাছ ক্যান মিয়ারা, একজন উইঠ্যা যাও না উপরে।

কে উঠবে, কে উঠবে না— তাই নিয়ে বচসা হলো কিছুক্ষণ। কারণ যে কেউতো আর উঠতে পারে না। এমন একজনকে উপরে উঠতে হবে, মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার অধিকার আছে যার। অবশেষে ঠিক হলো— তকু ব্যাপারীই উঠবে উপরে। মেয়ের আপন চাচা হয় সে। সুতরাং অধিকারের প্রশ্ন আসে না।

তকু ব্যাপারীকে উপরে উঠতে দেখে খেপে গেলো সখিনা। চিৎকার করে ওকে শাসাতে লাগলো সে, খবরদার, খবরদার ব্যাপারী, জানে খতম কইরা দিমু। বলে ছোট ছোট ডালপাতা ছিঁড়েছিঁড়ে ওর ঘাড়ের ওপরে ছুড়ে মারতে লাগলো সে। তারপর অকস্মাৎ একলাফে দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটা। অনেক কষ্টে দীঘির পানি থেকে পাড়ে তুলে আনা হল তাকে। কলসি কলসি পানি ঢালা হলো মাথার ওপর। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো সখিনার, তখন সে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে একটা কথাও বলেনি সখিনা। একটা প্রশ্নের জবাব দেয়নি সে। তাই আজ সকালে গনুমোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে ওকে, যদি ভূতটাকে কোনোমতে তাড়ানো যায়। নইলে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে

রাখা অসম্ভব হবে। ব্যাপারীর ভাইয়ের কাছ থেকে সবকিছু শুনলো মন্তু। গনু মোল্লার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা সাদা কাপড়কে সরষে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেই কাপড়টাকে সখিনার নাকের ওপরে গনু মোল্লা ধরছে আর চিৎকার করে বলছে, কোন্‌হান থাইকা আইছস শিগগির কইরা ক— নইলে কিন্তুক ছাড়মু না আমি। ক' শিগগির।

সখিনা নীরব। তার ঘাড়ের ওপর চেপে থাকা ভূতটা কোনো কথাই বলছে না।

মন্তু আর দাঁড়ালো না সেখানে। ঘরের পেছন থেকে একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে করতে পুকুরঘাটে চলে গেলো সে। পুকুরপাড়ের পেয়ারাগাছের নিচে লাউগাছগুলোর জন্য একটা মাচা বাঁধছে হালিমা। এখন দেখলে কে বলবে যে ওই মেয়েটা এই গতকাল রাতে ওই পেয়ারাগাছটার ডালে গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ওর দিকে চোখ পড়তে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার মাচা বাঁধতে লাগলো হালিমা।

## ॥ পাঁচ ॥

নৌকোটা ঘাটে বেঁধে রেখে একগাদা কাদা ডিঙিয়ে পাড়ে উঠে আসে ওরা। মন্তু আর করিম শেখ। হাটের এককোণে মনোয়ার হাজীর চায়ের দোকনে বসে গরম দু-কাপ চা খায়।

হাটের নাম শান্তির হাট। কিন্তু সারাদিন অশান্তিই লেগে থাকে এখানে। দূর দূর বহুদূর গ্রাম থেকে লোক আসে সওদা করতে। খুচরো জিনিসপত্রের চেয়ে পাইকারি জিনিসপত্রের বিক্রি অনেক বেশি। এখান থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে আর ছোট ছোট হাটবাজারের দোকানিরা দোকান চালায়।

মাঝেমাঝে দু-একটা সার্কাস-পার্টিও আসে এখানে। তখন সমস্ত পরগণায় সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে ছেলে বুড়ো মেয়ে এসে জড়ো হয় এখানে। দোকানিদের তখন খুশির অন্ত থাকে না। জোর বিক্রি চলে। নদীর পাড়ের ভরাট জায়গাটায় কয়েকটা দোচালা ঘর তুলে নিয়ে সেখানে হোটেল খোলে কেউ। ভিড় লেগেই থাকে।

মনোয়ার হাজীর সঙ্গে করিম শেখের অনেক দিনের খাতির। এ হাটে এলে একমাত্র হাজীর দোকানেই চা খায় করিম। হাজীও বাইরে কোথাও যেতে হলে করিম শেখের নাও ছাড়া অন্য কারো নৌকোয় যায় না। চায়ের পয়সা দিতে এলে হাজী একমুখ হেসে শুধালো, কি মেয়া খবর খুব ভালো তো?

করিম শেখ বিরক্তির সঙ্গে বললো, আর খবর, হাঁপানি হয়া মরতাছি।

আহা, ওইডা আবার কহন থাইকা হইলো? হাজীর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। তা মেয়া হাঁপানি নিয়া না বাইরলেই পারতা।

কী আর করুম ভাই। পেটতো চলে না। করিম শেখ আস্তে করে বললো, পেট তো ঠাণ্ডা গরম কিছু মানে না।

মন্তুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে করিম।

কিছুক্ষণ হাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা।

তারপর আবার নৌকোয়।

যাত্রী নিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় ওদের।

করিম শেখ হাল ধরে বসে থাকে। মন্তু দাঁড় বায়।

আকাশটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে দু-পাশের গ্রামগুলো। মাঝেমাঝে দু-একটা কিম্বা হঠাৎ কোথাও একসার বাতি দুলতে দুলতে এগিয়ে যেতে দেখলে চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়, হাট থেকে ফিরছে ওরা হাটুরের দল।

মাঝেমাঝে দু-একটা শিয়াল আর অনেকগুলো কুকুরের দলবাঁধা ডাক শোনা যায়। আর উজান নদীর একটা কলকল শব্দ।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে মন্তু ঃ

আশা ছিলো মনে মনে, প্রেম করিমু তোমার সনে।
তোমায় নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে ॥

গানের সুর বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। করিম শেখ হুঁকোটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে, নাও মিয়া তামুক খাও।

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নেয় মন্তু। গুড়ুক গুড়ুক টান মারে হুঁকোতে। তারপর আবার গান ধরে, আশা ছিলো মনে মনে।

গান শুনে করিম শেখের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। ও বলে, এইবার একডা বিয়াশাদি করমু ঠিক করছি। একা-একা আর ভালো লাগে না।

মন্তু গান থামিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। অন্ধকারে ওর মুখখানা ভালো করে দেখতে পায় না সে।

করিম শেখ আবার বলে, কি মিয়া কিছু কও না যে ?

মন্তু বলে, বিয়া করবা সেতো ভালো কথা।

করিম শেখ বলে, করবার তো ইচ্ছা হয়, করি কারে ? ভালো দেইখ্যা একটা মাইয়া দেহায়া দাও না।

মন্তু হাসে, বলে, ভালো মাইয়া পাইলে কি আর নিজে এতদিন অবিয়াত থাকি মিয়া। বলে আবার গান ধরে সে ঃ

আশা ছিলো মনে মনে।

বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখলো, বুড়ো মকবুলের ঘরের সামনে একটা ছোটখাটো জটলা বসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করছে মকবুল। বাড়ির সবার চেয়ে বয়সে বড় সে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না-করে কিছু করে না বুড়ো। অন্য সবার বেলায়ও তাই। মকবুলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনোদিন কোনো কাজকারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়তো রশীদের মনোমালিন্য আছে। আবুলকে হয়তো মকবুল দু-চোখে দেখতে পারে না। গনু মোল্লাকে হয়তো দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার অভিশাপ দেয় ফকিরের মা। কিন্তু, বাড়ির মান-সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোনো কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা। মন্তুকে আসতে দেখে ওর দিকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিলো সালেহা, বহ মন্তু মিয়া বহ।

আলোচনার ধারাটা মুহূর্তে বুঝে নিলো মন্তু।

বুড়ো মকবুলের মেয়ে হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনিদের বাবার বাড়ির গ্রাম থেকে। আজ সন্ধ্যায় টুনিকে নিয়ে যাবার জন্যে ওর বাবার বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো। সেই দিয়ে গেছে প্রস্তাবটা। জুলু শেখের বেটা কদম শেখ। হাল গরু জমি সব আছে ওদের। খাস গেরস্ত ঘরের ছেলে। বিয়ে একটা অবশ্য করেছিলো একবার। মাস তিনেক হলো বউ মারা গেছে।

আমেনা বলছে, অত চিন্তা কইরা কী অইবো। পাকা কথা দিয়া দ্যান।

গনু মোল্লা বললো, সব খোদার ইচ্ছা। মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকবো। বড় বেশি বাছবিচার কইরোনা।

মকবুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো, হ্যাঁ, তাতো ঠিক কথা।

হীরনের বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, মাঝখানে রশীদের বউ সালেহা বলে উঠলো, আমাগো মন্তু মিয়ারেও এইবারে একডা বিয়া করাইয়া দ্যান।

এককোণে নীরবে বসেছিলো মন্তু। ওর দিকে তাকিয়ে সকলে সালেহার কথায় একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলো।

বুড়ো মকবুল গম্ভীর গলায় বললো, হুঁ, ঠিক কথা কইছ সালেহা। ওর লাইগা একটা মাইয়া দেহন লাগে।

আমেনা বললো, ওর তো বাপ মা কেউ নাই, আপনারা আছেন দেইখা শুইনা করায়া দেন বিয়াডা।

সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন মেয়ে নিয়েও আলাপ করলো ওরা।

ফাতেমার এক খালাতো বোন আছে। রসুন তার নাম। রসুনের মতো সাদা-হলুদে মেশানো গায়ের রঙ। সুঠাম দেহ। টানা টানা চোখ। বয়স তেরো-চৌদ্দ হবে।

আবুল বললো, ওর মামার এক মেয়ে আছে। দেখতে যেন হুরপরী। তাই মামা আদর করে পরী বলে ডাকে। শুধু স্বভাবটা যেন একটু কেমন কেমন। তাও তেমন কিছু নয়। খায় একটু বেশি। আর ঘুমোয়। মকবুল পরক্ষণে বললো, ও মাইয়া ঘরে আইনা কাজ নাই মিয়া।

আমেনা বললো, অত দূরে-দূরে যাইতাছ ক্যান, নিজ গেরামে দেহ না। আমাগো আম্বিয়া কি খারাপ মাইয়া নাহি ! ও হইলেই খুব ভালো হয়। দিনরাত গতর খাটাবার পারে। মন্তু মিয়ারে সুখে রাখবো।

আম্বিয়ার প্রশ্নে কারো কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। ও মেয়ে গতর খাটাতে পারে একথা সত্যি। কিন্তু ঘরের বউ করে আনার মতো মেয়ে নয়।

মকবুল বললো, ওগো বংশে হাঁপানি রোগ আছে। শেষে হাঁপানি হইয়া মন্তুও মরবো।

মন্তু কিন্তু একটা কথাও বললো না। সে চুপ করে বসে রইল এককোণে। আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সেদিনের মতো উঠে গেলো সবাই। একটু পরে যে-যার ঘরে চলে গেলো ওরা।

পিদিম জ্বালিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হলো মন্তু। মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলার ফুল ঝুলছে। বকের মতো সাদা ধবধবে পাতার মাঝখানে হলুদ রঙের কুঁড়ি। ডাঁটাসহ ফুলগুলো মাচাঙ থেকে নামিয়ে নিলো মন্তু।

আজ সন্ধ্যায় বাপের বাড়ি চলে গেছে টুনি। যাবার আগে এগুলো রেখে গেছে ওর ঘরে। একটুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠলো মন্তুর ঠোঁটের কোণে। ফুলগুলো আবার মাচাঙের উপর তুলে রেখে বিছানাটা নামিয়ে নিলো মন্তু।

## ॥ ছয় ॥

কিছুদিন ধরে বেশ শীত পড়তে শুরু করেছে।

দিনের বেলা ঈষৎ গরম। শেষরাতে প্রচণ্ড শীতে হাড়কাঁপুনি শুরু হয়। কাঁথার নিচেও দেহটা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

এ সময়ে বাড়ির সবাই মাটির ভাঁড়ে ভুসির আগুন জ্বেলে মাথার কাছে রাখে। মাঝে মাঝে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আগুনটা উস্কে দেয়।

আজকাল ভোর হবার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে যায় মন্তু। সোয়া দু-টাকা দিয়ে কেনা খদ্দরের চাদরটা গায়ে-মাথায় মুড়িয়ে নিয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি-বাড়ির দিকে ছুটে সে। কদিন হলো করিম শেখ হাঁপানিতে পড়েছে। সারাদিন খুকখুক করে কাশে আর লম্বা লম্বা শ্বাস নেয়।

মন্তু বলে, একডা কবিরাজ দেহাও মিয়া।

করিম বলে, কিচ্ছু হয় না মিয়া, অনেক দেহাইছি।

আম্বিয়া বলে, হাটে-গঞ্জে যাও, ভালো দেইখা ডাকতর দেখাইতা পারো না?

করিম শেখ চুপ করে থাকে, কিচ্ছু বলে না।

আজ সকালে মাঝি-বাড়ির দিকে সবে রওনা দিয়েছে মন্তু। দাওয়া থেকে মকবুল ডেকে বললো, রাইতের বেলা একটু সকাল কইরা ফিরো মন্তু মিয়া। হীরনের বিয়ার ফর্দ হইব আইজ।

বাড়ির সকলকে আজ একটু সকাল-সকাল ঘরে ফিরে আসতে বলে দিয়েছে বুড়ো মকবুল। বিদেশ থেকে মেহমানরা আসবে, ওদের খাতির-যত্ন করতে হবে। আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হবে ওদের। নইলে বাড়ির বদনাম করবে ওরা।

মন্তুর উপরে আরো একটা ভার দিয়েছে মকবুল। নাও নিয়ে গিয়ে টুনিকে বাপের বাড়ি হতে নিয়ে আসতে হবে।

দু-একদিনের মধ্যে নবীনগরে যাবে মন্তু। করিম শেখের শরীরটা একটু ভালো হয়ে উঠলেই নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে।

পথের দু-পাশের ক্ষেতগুলোতে কলাই, মুগ, মটর আর সরষে লাগানো হয়েছে। সারারাতের কুয়াশায় এই সকালে সতেজ হয়ে উঠেছে ওরা। রোদ পড়ে শিশির ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে ওদের গায়ে।

মাঝি-বাড়ির দেউড়ির সামনে আম্বিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মন্তুর। পুকুর থেকে এইমাত্র গোছল করে ফিরছে সে। ঘন কালো চুলগুলো থেকে গড়িয়ে এখনো পানি ঝরছে। হাতের ভেজা শাড়িটার পানি নিংড়াতে নিংড়াতে আম্বিয়া বললো, মন্তু ভাই হুট কইরা চইলা যাইও না। পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও।

মন্তু বললো, এই সকালবেলা গোছল করছো, তোমার শীত লাগে না?

আম্বিয়া একটু হাসলো শুধু। কিছু বললো না।

সারারাত মিয়া-বাড়িতে ধান ভেনেছে সে। এই শীতের রাতেও ধান ভানতে গিয়ে সারা দেহে ঘাম নেমেছে ওর। পুরো গায়ের কাপড়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ। তাই সকাল-সকাল গোছল করে নিয়েছে আম্বিয়া। খেয়েদেয়ে একটু পরে ঘুম দেবে। উঠবে সেই অপরাহ্নে। তারপর আবার মিয়া-বাড়ি চলে যাবে আম্বিয়া। ধান ভানবে সারারাত।

মন্তুকে একটা পিঁড়িতে বসতে দিয়ে ওর সামনে একবাসন পিঠা এগিয়ে দিলো আম্বিয়া।

কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে করিম শেখ বললো, খাও মিয়া খাও। বলে আবার কাশতে শুরু করলো সে। আম্বিয়া তখন পাশের ঘরে গিয়ে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। মাঝেমাঝে বুড়ো নন্তু শেখের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে সে।

বেড়ার খুপরি দিয়ে চোরা চাউনি মেলে ওকে দেখতে লাগলো মন্তু। আঁটসাঁট দেহের খাঁজে-খাঁজে দুরন্ত যৌবন। আটহাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙে ফেটে পড়তে চায়। আজ আম্বিয়াকে বড় ভালো লাগছে মন্তুর। চোখের পলকজোড়া ঈষৎ কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ, আম্বিয়াকে বিয়ে করবে সে। হোক হাঁপানি। সে পরে দেখা যাবে। বুড়ো মকবুলকে আজকেই ওর মনের কথাটা জানিয়ে দেবে মন্তু। সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে বসলো সে।

করিম শেখ লম্বা শ্বাস নিয়ে বললো, কি মিয়া হাত তুইলা বইসা রইলা যে ?

মন্তু তাড়াতাড়ি একটা পিঠা মুখে পুরে দিয়ে বললো, হুঁ হুঁ এই তো খাইতাছি। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো বাসনটা শূন্য করে দিলো মন্তু।

কাঁথাটা ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিম শেখ কাঁপা গলায় বললো, আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।

আহা অমন কথা কয় না মিয়া। অমন কথা কয় না। পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মন্তু বললো, মরণের কথা চিন্তা কইরতেই নাই, আয়ু কইমা যায়।

করিম শেখ তবু বিড়বিড় করে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করতে লাগলো।

রাতে এলো ওরা।

বরের মামা, চাচা, আরো দু-তিনজন লোক।

হীরনের বিয়ের ফর্দ হবে আজ।

মকবুলের বাইরের ঘরটাতে ফরাশ পেতে বসানো হলো ওদের। গনু মোল্লা বসলেন সবার মাঝখানে।

আবুল, রশীদ আর সুরত আলী ওরাও বসলো সেখানে। বুড়ো মকবুল প্রথম আসতে রাজি হয়নি। বলছিলো, তোমরা সবাই আছো, ভালো মন্দ যা বুঝ আলাপ কর গিয়া। আমারে ওর মধ্যে টাইনো না।

রশীদ বললো, কী কথা, আপনের মাইয়া, আপনে না থাকলে চলবো কেমন কইরা ?

ঘরের ভেতর থেকে বরের চাচা হাঁক ছাড়লো, কই, বেয়াই কই, তেনারে দেহি না ক্যান ?

অবশেষে ঘরে এসে এককোণে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লো মকবুল।

প্রথমে মেহমানের ভাত খাওয়ানো হবে। তারপরে ফর্দ হবে বিয়ের।

মন্তু এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলো কখন বুড়ো মকবুলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা পাওয়া যায়। তাহলে নিজের বিয়ের কথা ওকে বলবে সে। এই শীতে, হ্যাঁ এই শীতেই বিয়ে করে ঘরে বউ আনতে চায় মন্তু। কিন্তু মকবুলকে একা পাওয়া গেল না।

সারা বাড়িতে আজ ভিড়।

রান্নাঘরে ভিড়টা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির মেয়ে পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা সবাই গিয়ে জুটেছে সেখানে। সারাক্ষণ বকবক করছে। কার কথা কে শুনছে কিছু বোঝা যায় না।

হাঁড়িপাতিলগুলো একপাশে টেনে নিয়ে বাসন-বাসন ভাত বাড়ছে আমেনা। হঠাৎ মন্তুকে সামনে পেয়ে আমেনা জিজ্ঞেস করলো, মানুষ কয়জন ?

মন্তু বললো, আটজন।

আটজন ! আমেনার মাথায় রীতিমতো বাজ পড়লো। আটজনের কি ভাত রানছি নাকি আমি ? আমি তো রানছি চাইরজনের। তোমার ভাইয়েয় আমারে চাইরজনের কথা কইছিল।

বড় ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে আসছিলো মকবুল, কথাটা কানে গেল ওর। পরক্ষণে ভিতরে এসে রাগে ফেটে পড়লো সে। আমি কি জাইনতাম, আটজন আইবো ওরা ? বারবার কইরা কইয়া দিছি চারজনের বেশি আইসেন না আপনারা। ওরা তহন মাইনা নিছে। আর এহন—বলে ঠোঁটজোড়া বিকৃত করে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করলো মকবুল, হালার ভাত যেন এই জন্মে দেহে নাই হালারা।

হইছে হইছে। আপনে আর চিল্লায়েন না, থামেন। মেজো বউ ফাতেমা চাপা গলায় বললো, যান যা আছে তা দিয়া একবার খাওয়ান। আমরা নাহয় পরে খামু।

ফাতেমার কথায় শান্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলো মকবুল। মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বললো, তাইলে মন্তু মিয়া তুমি কাইল পরশু একদিন নবীনগর যাও। কেমন ?

মন্তু সংক্ষেপে ঘাড় নাড়লো।

নিজের কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না সে। সহসা তার মনে একটা নতুন চিন্তা এলো। টুনি ফিরে এলে ওকে দিয়ে কথাটা মকবুলকে বলাবে মন্তু।

খাওয়া-দাওয়া শেষে ফর্দ করতে বসলো সবাই।

প্রথমে উঠলো দেনা-পাওনার প্রশ্নটা।

বরের চাচা ইদন শেখ বললো, অলঙ্কারপত্র বেশি দিবার পারমু না মিয়া। হাতের দুইজোড়া চুড়ি আর কানের দুইডা ঝুমকা।

গলার আর কমরেরডা দিবো কে ? সুরত আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওইগুলাও দিতে অইবো আপনাগোরে।

পায়েরটারে বাদ দিয়া দিলা ক্যান অ্যাঁ ? আবুল জোরের সঙ্গে বললো, পায়ের একজোড়া মলও দেওন লাগবো।

বুড়ো মকবুল নড়েচড়ে বসলো। সুরত আর আবুলের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকালো সে।

বরের মামা আরব পাটারী মৃদু হেসে বললো, এই বাজারে এতগুলান জিনিস দিতে গেলে কি কম টাকার দরকার মিয়া। আরো একটু কমসম কইরা ধরেন।

আচ্ছা, পায়েরটা নাহয় নাই দিলেন। মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থতা করে দিলো রশীদ। বাকিগুলান তো দিবেন ?

হ্যাঁ তাই সই। সুরত আলী বললো, সোনার জিনিস তো আর দিবার লাগছেন না, রূপার জিনিস দিবেন। তা মন কষাকষির কী দরকার ?

মকবুল কিছুই বললো না। একপাশে বসে রইলো চুপ করে। গনু মোল্লাও নীরব। শুধু তস্‌বি পড়ছেন ঢুলে ঢুলে।

গহনার কথা শেষ হলে পরে মোহরানার কথা উঠলো।

ইদন শেখ বললো, সব ব্যাপারে আপনাগোডা মাইনা নিছি। এই ব্যাপারে কিত্তুক আমাগোডা মাইনতে অইবো।

আহা কয়েন না শুনি। রশীদ ঘাড় ঝাঁকালো।

ইদন বললো, মোহরানাডা পাঁচ টাহাই ধরেন।

পাঁচ টাহা ? অ্যাঁ, পাঁচ টাহা ? কন কি ? রীতিমতো খেপে উঠলো সুরত। মাইয়া কি মাগনা পাইছেন নাহি ? অ্যাঁ ? মাইয়ার কি কোনো দাম নাই ?

আহ্, দাম আছে বইলাইতো পাঁচ টাহা কইবার লাগছি। নইলে কি আর তিন টাকার উপরে উঠতাম। আরব পাটারীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়লো। কণ্ঠস্বরে বিকৃতি এনে সে

বললো, সক্কল দিক দিয়াই বাড়াবাড়ি করবার লাগছেন আপনারা। আচ্ছা যান, আরো আট আনা বাড়াইয়া দিলাম। মোট সাড়ে পাঁচ টাহা।

না বিয়াই। তা অয় না, অইবো না। এতক্ষণে কথা বললো বুড়ো মকবুল, এত কম মোহরানায় মাইয়ারে বিয়া দিবার পারমু না, বলে হঠাৎ কেঁদে উঠলো সে, মাইয়া আমার কইলজার টুকরা বেয়াই। কত কষ্ট কইরা মানুষ করছি। দু-হাতে চোখের পানি মুছলো বুড়ো মকবুল। বিশ টাহা যদি মোহরানা দেন তাইলে মাইয়া বিয়া দিমু।

মকবুলের চোখের পানি দেখে অপ্রতিভ হয় গেল সবাই। মাঝরাত পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর সোয়া এগারো টাকায় মিটমাট হলো সব। বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে মেহমানরা বিদায় নিয়ে গেলো।

মনে-মনে খুশি হলো মকবুল। সোয়া এগারো টাকা মোহরানায় এর আগে এ বাড়ির কোনো মেয়ের বিয়ে হয়নি।

## ॥ সাত ॥

নবীনগরের ছোট খালে এসে নাওয়ের নোঙর ফেললো মন্তু।

খালপাড়ে উঠে দাঁড়ালে টুনিদের বাড়ির লম্বা নারকেল আর তালগাছগুলো দেখা যায়। আর সেই তাল-নারকেলের বনের ফাঁকে ওদের দেউড়ি-ঘরটাও চোখে পড়ে এখান থেকে।

নৌকা থেকে নামবার আগে মুখ-হাতটা ভালো করে ধুয়ে নিলো মন্তু। পুরনো লুঙিটা পালটে নিয়ে নতুন লুঙিটা পরলো, ফতুয়াটা খুলে জামাটা গায়ে দিলো সে। তারপর খদ্দরের চাদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাতাটা বগলে নিয়ে ধীরেধীরে নৌকো থেকে নেমে এলো মন্তু।

কিছুদূর এসে পকেট থেকে টুপিটা বের করলো।

আসার সময় বুড়ো মকবুল বারবার করে বলে দিয়েছে, কুটুমবাড়িতে গিয়ে যেন মন্তু এমন কিছু না করে যার ফলে বাড়ির বদনাম হতে পারে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো মন্তু। পথঘাট জানা আছে ওর। এর আগে মকবুলের বিয়ের সময় একবার এসেছিলো সে। দিন তিনেক থেকে গিয়েছে এখানে। রাস্তায় দু-চারজন অপরিচিত লোক ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ওকে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুর উড়ে যাচ্ছে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে। একটু-একটু করে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। এদিকের লোকেরা এরমধ্যে খেজুরগাছ কেটে রস নামাতে শুরু করে দিয়েছে। পথে আসতে তিন-চারজন গাছুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মন্তুর। ধারালো বাটাল দিয়ে গাছ কাটছে ওরা। তারপর মাটির কলসি ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসছে গাছ থেকে।

টুনিদের বাড়ির সামনে এসে যার সঙ্গে মন্তুর প্রথম দেখা হলো সে টুনির চাচা মোতালেব শিকদার। সন্ধেবেলা গরু-বাছুরগুলোকে ঠেঙিয়ে গোয়ালঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো সে। মন্তুকে আসতে দেখে হা করে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, মন্তু মিয়া না? কী মনে কইরা।

মন্তু এগিয়ে এসে পা ধরে সালাম করলো ওর। তারপর বললো, ভাইজান পাডাইছে, টুনি ভাবীরে নিবার লাইগা।

অ। মুখখানা ঈষৎ ফাঁক করে গরুগুলোকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে আবার গোয়ালঘরের দিকে চলে গেলো মোতালেব শিকদার।

একটু পরে আবার ফিরে এল সে। বললো, আয়েন ভিতরে আয়েন।

টুপিটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিলো মন্তু, তারপর শিকদারের পিছুপিছু ভেতর-বাড়িতে এগিয়ে চললো সে।

দেউড়ির পাশে একখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাইরের লোকদের কাছ থেকে ভেতর-বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে। তারই পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে অবাক চোখে দেখছে ওরা।

ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতে মন্তু দেখলো, ঘরের দাওয়ায় একটা বাঁশের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টুনি। সারামুখে ওর হাসি যেন উপচে পড়ছে। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

মন্তুকে টুনিদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল শিকদার।

রসুইঘর থেকে টুনির মা বেরিয়ে এলো বাইরে। মন্তু সালাম করলো তাকে।

মা বললো, কইরে টুনি। মিয়ারে একখানা জলচকি আইনা দে, বউক।

চৌকি এনে দিলে দাওয়ায় বসলো মন্তু।

টুনির মা সবার কুশল জানতে চাইলো। টুনি কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, শুধু মুখ টিপে বারবার হাসতে লাগলো সে।

টুনির মা বললো, টুনি তো কদিন ধইরা যাওনের লাগি উথালপাথাল লাগাইছে।

উ যাইবো। যামুনা আমি। সঙ্গেসঙ্গে প্রতিবাদ জানালো টুনি।

মা বললো, দাঁড়ায়া থাইকো না। মিয়ার অজুর পানি দাও।

মন্তুর জন্যে হাতমুখ ধোয়ার পানি আনতে চলে গেল টুনি। মাও গেলো একটু পরে, বললো, তরকারিটা নামাইয়া আই।

চারপাশটা তাকিয়ে দেখছিল মন্তু। এ ক-বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে বাড়িটার। উঠানের কোণে পাশাপাশি দুটো জামগাছ ছিলো। কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরের একপাশটা নুয়ে পড়েছে এখন। আগে অমনটি ছিলো না। আগে গোয়ালঘরটা পুকুরের পুবপাশে ছিলো, এখন সেটা উত্তরপাশে সরিয়ে আনা হয়েছে।

টুনি এসে একঘটি পানি রাখলো ওর সামনে, আর একজোড়া খড়ম। বললো, হাতমুখ ধুইয়া নাও।

মন্তু মুখ-হাত ধুয়ে নিলে ওর দিকে একটা গামছা বাড়িয়ে দিয়ে টুনি বললো, চলো ভেতরে চলো, বাইরে শীত পড়তাছে।

মন্তু কোনো কথা বললো না। শান্ত শিশুর মতো ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেলো সে।

পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। ও পাশেরটাতে মা-বাবা থাকে আর টুনির ছোট-ছোট দুই ভাইবোন। এ পাশের ঘরটা দেখিয়ে টুনি মৃদু হেসে বললো, এইডা আমার ঘর।

ওর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো মন্তু। ছোটঘর মালপত্রে ভরা। কয়েকটা বড়বড় মাটির ঘটি এককোণে রাখা, তার পাশে তিন-চারটে বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ি-ভর্তি লাল আলু রাখা আছে। দক্ষিণকোণে একটা কাঠের চৌকি। চৌকির ওপরে একটা কাঁথা বিছানো। একটা তেল চিটচিটে বালিশ। চৌকির নিচে দুটো ছোট ছোট টিনের প্যাটরা। পশ্চিমের বেড়ার সঙ্গে একটা কাঠের তাক বসানো হয়েছে। তাকের

ওপরে রাখা আছে কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন। তারপাশে বেড়ার সঙ্গে একটা ভাঙা আয়না ঝোলানো। উত্তরকোণে একটা দড়ির সঙ্গে ঝুলছে টুনির দু-খানা শাড়ি, ব্লাউজ আর একটা ময়লা কাঁথা। তাছাড়া ঘরের ঠিক মাঝখানে চিলেকাঠের সঙ্গে কতগুলো ছিকে। ছিকের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়িপাতিল রাখা।

মন্তু মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিলো পুরো ঘরটার ওপর।

টুনি চৌকিটা দেখিয়ে বললো, এইখানে বও।

মন্তু বসলো।

কিছুক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুনি বললো, অমন শুকায়া গেছ ক্যান ?

মন্তু পরক্ষণে বললো, কই না, শুকাই নাই তো।

টুনি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মন্তুর মনে হলো, এ ক-মাসে টুনি অনেক পালটে গেছে। ওর দেহ পা আগের থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে আর পায়ের রঙে একটা চিকচিকে আভা জেগে উঠেছে। আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে টুনি।

রাতে টুনির ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত হলো।

ময়লা কাঁথাটার ওপর ওর একখানা শাড়ি বিছিয়ে দিলো। বালিশটাকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে দিলো। তারপর বললো, আর বইসা থাইকো না, শুইয়া পরো।

মন্তু বললো, বেহান রাইতে কিন্তুক রওয়ানা দিতে অইবো।

ওর কথা শেষ না হতে শব্দ করে হেসে দিলো টুনি। বললো, ইস, কইলেই অইলো। তারপর একটুকাল থেমে আবার বললো, সে কম কইরা অইলেও তিনদিন আমাগো বাড়ি বেড়ান লাগবো। তারপরে যাওনের নাম।

মন্তু বললো, পাগল অইছ ? তাইলে ভাইজানে মাইরা ফালাইবো আমারে। করিম শেখের নাও নিয়া আইছি.....আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সে।

টুনি বললো, যাই শুই গিয়া, কথা যা অইবার কাইল সকালে অইবো। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল সে।

কুপিটা নিবিয়ে দিয়ে একটু পরে শুয়ে পড়লো মন্তু। করিম শেখের কথা মনে হতে আম্বিয়ার কথাও মনে পড়ছে তার।

এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে টুনিকে সব বলবে মন্তু। টুনি নিশ্চয় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ওকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।

ঘুম ভাঙলো কখন সে ঠিক বলতে পারবে না। রাতের গভীর অন্ধকারে সে শুধু অনুভব করলো একটা হাত তার চুলগুলো নিয়ে খেলছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলো মন্তু।

গনু মোল্লার কাছ থেকে নেয়া তাবিজটা বাহুতে বাঁধা আছে কিনা দেখলো। তারপর কে যেন চাপাস্বরে ওকে ডাকলো, এই।

সহসা কোনো সাড়া দিলো না মন্তু। হঠাৎ ওর হাতখানা শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো সে। নরম তুলতুলে একখানা হাত।

একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি শোনা গেলো, উহ্ এই।

পরমুহূর্তে হাতখানা ছেড়ে দিলো মন্তু। টুনি ?

ইস, কথা কয়ো না। মায় হুনব। ওর মুখের ওপরে একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর মুখখানা আরো নামিয়ে এসে আস্তে করে বললো, চুপ, শব্দ কইরো না। শোনো, চুপচাপ উইঠ্যা আইও আমার সঙ্গে।

কিছু বুঝে উঠতে পারলো না মন্তু। টুনির মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। তারপর ধীরেধীরে উঠে বসলো।

বাইরে এসে দেখলো টুনির হাতে একটা মাটির কলস। শীতে দুজনে রীতিমতো কাঁপছিলো।

মন্তু প্রশ্ন করলো, কী, কী অইছে।

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, কিছু অয় নাই, এদিকে আইও।

ওর একখানা হাত ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে চললো। বার-বাড়িতে এসে মন্তু আবার প্রশ্ন করলো, কই চললা ?

টুনি শব্দ করে হাসলো আবার। বললো, কলসি গলায় দিয়ে দুইজনে পুকুরে ডুইবা মরুম চলো। তারপরেই মন্তুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সহসা প্রশ্ন করল সে, আমার সঙ্গে মরতে পারবা না ?

কী উত্তর দেবে ভেবে পেলো না মন্তু। কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা না-করে আবার হেসে উঠলো টুনি। হাসির দমকে দেহটা বারবার দুলে উঠলো তার। বললো, ঘাবড়ায়ো না মিয়া, তোমারে মারুম না ।

বলে আবার চলতে লাগলো।

এতক্ষণ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলো মন্তু যে শীতের প্রকোপটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে-না-যেতে প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁত লেগে এলো ওর।

একটা লম্বা খেজুরগাছের নিচে এসে দাঁড়ালো টুনি। কলসিটা মন্তুর হাতে দিয়ে বললো, এইটা রাখো হাতে।

তারপর পরনের শাড়িটাকে লুঙির মতো গুটিয়ে নিল সে। মন্তু কাঁপা গলায় শুধালো, কী করো ?

ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না টুনি। নির্বিকারভাবে খেজুরগাছটা বেয়ে উপরে উঠে গেলো সে।

মন্তুর মনে হলো ও স্বপ্ন দেখছে।

একটু পরে একহাতে রসের হাঁড়িটা নিয়ে অন্যহাতে গাছ বেয়ে ধীরেধীরে নিচে নেমে এলো টুনি। কলসির মধ্যে রসটা ঢেলে হাঁড়িটা রেখে আসার জন্য আবার উপরে যাচ্ছিলো টুনি। মন্তু বললো, আরে কী করো। গাছ এখন পিছল। পইড়া যাইবা।

পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসলো টুনি। বললো, ইস্ কত উঠছি।

পাশের ঝোপ থেকে দুটো শিয়াল ছুটে এসে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে মন্তুর দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চোখজোড়া অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ওদের। মন্তু একটা ধমক দিতে ছুটে পালিয়ে গেলো ওরা।

টুনি নেমে এসে বললো, কারে ধমকাও ?

মন্তু আস্তে করে বললো, শিয়াল।

আরো অনেকগুলো খেজুরগাছ থেকে রস নামিয়ে কলসি ভর্তি করলো ওরা।

শীতের কুয়াশার বৃষ্টি ঝরছে চারদিকে। মাটি ভিজে গেছে। গাছের পাতাগুলোও ভেজা। আশেপাশে তাকাতে গেলে বেশিদূরে দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢেকে আছে চারদিক। হঠাৎ মন্তুর গায়ে হাত দিয়ে টুনি বললো, শীত লাগতাছে বুঝি?

মন্তু কোনো জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলো, তোমার লাগে না?

টুনি বললো, উঁহু। বলে মাথাটা দোলালো সে।

মন্তু বললো, রস দিয়া করবা কী?

টুনি বললো, সিন্নি রান্দুম।

মন্তু কোনো কথা বলার আগেই টুনি আবার বললো, তোমার নায়ে চলো।

মন্তু অবাক হলো, নায়ে গিয়া কী করবা?

টুনি নির্লিপ্ত গলায় বললো, সিন্নি রান্দুম।

মন্তু বললো, পাগল হইছ?

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, হুঁ। মন্তুর মুখের দিকে তাকালো সে, কই নাওয়ে যাইবা না।

মন্তু কঠিন স্বরে বললো, না।

ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো টুনি। ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মুহূর্তে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো সে। হাতের কলসিটা উপরে তুলে মাটিতে ছুড়ে মারলো। মাটিতে পড়ে মাটির কলসি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রস গড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

কিছুক্ষণের জন্য দুজনে বোবা হয়ে গেল।

কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না।

মন্তু নীরবে তাকিয়ে রইলো ভাঙা কলসির টুকরোগুলোর দিকে।

টুনি মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পুকুরপাড়ে লম্বা তালগাছগুলোর মাথায় দুটো বাদুর হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উঠলো।

টুনি আস্তে করে বললো, চলো ঘরে যাই, চলো।

মন্তু কোনো কথা বলল না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলো শুধু।

পরদিন যাওয়া হলো না মন্তুর।

টুনির মা বললো, কুটুমবাড়ি আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, আর যায় পরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তো আর যাইতে পারবা না মিয়া। যহন যাইতে দিমু তহন যাইবা।

অগত্যা থেকে যাওয়া হলো।

সারাদিন একবারও কাছে এলো না টুনি। অথচ সারাক্ষণ বাড়িতে ছিলো সে। ঘরদোর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেছে। ঘাটে নিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে এনেছে। রান্নাবান্না করেছে।

তারপর খাওয়ার সময় মা ডেকে বলেছে, কইরে টুনি এইদিকে আয়। মন্তু মিয়াকে ভাত বাইড়া দে।

তখন শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থেকেছে সে। রাতের বেলা হঠাৎ বেঁকে বসলো টুনি। বললো, কাল সক্কালবেলাই চইলা যামু আমি। জিনিসপত্র সব গুছাইয়া দাও।

মা বললো, আরো দুইটা দিন থাইকা যা। আবার কবে আইবার পারবি কে জানে।

টুনি বললো, না, মন্তু মিয়ার কামকাজের ক্ষতি অইয়া যাইতেছে।

মা বললো, মন্তু মিয়াকে বুঝাইয়া কইছি। হে রাজি আছে।
টুনি তবু বললো, না কাল সক্কালেই চইলা যামু।
পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সব শুনলো মন্তু।
পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেলো ওরা।
মন্তু আর টুনি।
ওর বাবা আর চাচা দুই শিকদার খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো ওদের। সঙ্গে ছোট দুই ভাইবোনও এলো। আর এলো ওদের কালো কুকুরটা।

ছইএর মধ্যে টুনির জন্যে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়েছিল মন্তু। তার ওপর গুটিসুটি হয়ে বসলো সে।

খালের পাড়ে যতক্ষণ তার বাবা, চাচা আর ভাইবোনদের দেখা গেলো ততক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো টুনি।

তারপর মুখখানা ঘুরিয়ে এনে নীরবে বসে রইলো।

খাল পেরিয়ে যখন নৌকো নদীতে এসে পড়লো তখন দুপুর হয়ে আসছে। টুনি এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। মন্তু সারাক্ষণ কথা বলার জন্য আঁকুপাকু করছিলো। কিন্তু একবারও সুযোগ দিলো না টুনি। উজান নদীতে দাঁড় বেয়ে চলতে চলতে একসময়ে মন্তু বললো, বাইরে আইয়া বহো, গায়ে বাতাস লাগবো।

ও নড়েচড়ে বসলো কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এলো না।

একটু পরে একটা কাপড়ের পুঁটুলি থেকে কিছু চিঁড়া আর একটুকরো খেজুরের গুড় বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলো টুনি। বললো, বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও। বলে আবার চুপ করে গেলো সে।

মন্তু বললো, তুমি খাইবা না?

না।

না ক্যান?

ক্ষিধা নাই।

ঠিক আছে আমারও ক্ষিধা নাই। বলে আবার দাঁড় বাইতে লাগলো মন্তু। নদীর পানিতে দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কিছুই শোনা গেলো না।

ক্ষণকাল পরে টুনি আবার বললো, খাইবা না?

না।

শেষে শরীর খারাপ করবো।

করুক গা। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল মন্তু।

আর বেশিক্ষণ ছইয়ের ভেতর বসে থাকতে পারলো না টুনি। অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। চিঁড়ার বাসনটা তুলে নিয়ে ওর সামনে এসে বসলো।

নাও, খাও।

কইলাম তো খামু না।

তাইলে কিন্তুক পানির মধ্যে সব ফালাইয়া দিমু আমি। টুনি ভয় দেখালো ওকে।

মন্তু নির্বিকার গলায় বললো, দাও ফালাইয়া।

কিন্তু ফেললো না টুনি। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। হাসির দমকে মাথার ঘোমটাটা খসে পড়লো কাঁধের ওপর।

টুনি বললো, আমি খাওয়াইয়া দিই?

মন্তু বললো, না।

টুনি বললো, তাইলে নিজে খাও। আমিও খাই। বলে একমুঠো চিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলো সে।

মন্তুর মুখেও একঝলক হাসি জেগে উঠলো। এতক্ষণে টুনির কোলের ওপরে রাখা বাসন থেকে একমুঠো চিঁড়ে নিয়ে সেও মুখে পুরলো।

টুনি বললো, গুড় নাও। খাজুরি গুড়।

চিঁড়ে খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সহজ হয়ে এলো টুনি। একফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি পৌছাইতে কতক্ষণ লাগবো ?

মন্তু একটু চিন্তা করে নিয়ে বললো, মাইজ রাতে।

বেশ জোরে দাঁড় বাইছিলো মন্তু।

হঠাৎ টুনি বললো, এত তাড়াতাড়ি করতাছ ক্যান ? আস্তে বাও না।

মন্তু বললো, তাইলে বাড়ি যাইতে তিনদিন লাগবো।

লাগে তো লাগুক না। টুনির কণ্ঠস্বরে চরম নির্লিপ্ততা।

মন্তু কোনো জবাব দিলো না।

আঁজলা ভরে নদীর পানি পান করলো ওরা। তারপর ছইয়ের বাইরে বসে টুনি দু-হাতে নদীর পানি নিয়ে খেলা করতে লাগলো। দু-পাশের অসংখ্য গ্রাম। একটার পর একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝেমাঝে রবিশস্যের ক্ষেত, নারকেল আর ঘন সুপুরির বন। জেলেদের পাড়া। ছোট ছোট ডিঙিনৌকায় চড়ে মাঝনদীতে এসে জাল ফেলেছে ওরা।

একখানা হাত পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে টুনি বললো, তুমি এইবার জিরাও। আমি দাঁড় টানি।

মন্তু হেসে বললো, পাগল নাকি ?

টুনি বললো, ক্যান ?

মন্তু বললো, অত সহজ না, দাঁড় বাইতে ক্ষেমতার দরকার আছে।

টুনি আবার চুপ করে গেলো।

বিকেলের দিকে শান্তির হাটের কাছাকাছি এসে পৌছলো ওরা। নদী এখন দম ধরেছে। পানিতে আর সেই স্রোত নেই। একটা থমথমে ভাব। একটু পরে জোয়ার আসবে। তখন আর নৌকো নিয়ে এগনো যাবে না। কূলে এসে বেঁধে রাখতে হবে। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে ভাটা পড়লে তখন আবার নৌকো ছাড়বে মন্তু।

দূর থেকে শান্তির হাটটা দেখা যাচ্ছে।

অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে সেখানে।

ওদিকে তাকিয়ে টুনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ওইহানে কী ?

মন্তু বললো, ওইটা শান্তির হাট।

টুনি পানি থেকে হাতটা তুলে নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গি করে বললো, ওইহানে চুড়ি পাওন যায় ? আমারে কিনা দিবা ?

মন্তুর ইচ্ছে, জোয়ার আসার আগে শান্তির হাটে গিয়ে নৌকা ভিড়াবে। তাই সংক্ষেপে বললো, হু, দিমু।

শান্তির হাটে পৌছে, একটা নিরাপদ স্থান দেখে নৌকা বাঁধলো মন্তু। নদীর পাড়ে খালি জায়গাটায় তাঁবু পড়েছে একটা। বিচিত্র তার রঙ। বাইরে ব্যান্ডপার্টি বাজছে খুব জোরে জোরে। চারপাশে লোকজনের ভিড়।

হাটের কাছে আসার পর থেকে ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে টুনি। সেখান থেকে মুখ বের করে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, ওইহানে কী ?

মন্তু বললো, সার্কাস পার্টি। সার্কাস পার্টি আইছে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে টুনি আবার বললো, সেইটা আবার কী ?

মন্তু বললো, নানা রকম খেলা দেহায় ওরা। মানুষের খেলা, বাঘের খেলা। আরো কত কী ?

বাঘের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলো টুনি। কিন্তু পরক্ষণে বললো, আমারে দেহাইবা ?

মন্তুর কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু হাটের মধ্যে মেয়েমানুষ নিয়ে যাওয়াটা সমীচীন বলে মনে হলো না ওর। তাই বললো, না, তোমার যাইয়া কাজ নাই। তুমি বহ, আমি আইতাছি।

ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে সঙ্গেসঙ্গে ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। বললো, ওমা, আমি একলা থাকবার পারুম না এহানে। তুমি যাইও না।

মুহূর্তে নিরাশ হয়ে গেলো মন্তু। ও নিজে এর আগে কোনোদিন সার্কাস দেখেনি। ভেবেছিলো এই সুযোগে একবার দেখে নেবে। কিন্তু টুনির কথায় ভেঙে পড়লো। সার্কাসের তাঁবুর দিকে চোখ পড়তে দেখলো শুধু পুরুষ নয়, অসংখ্য মেয়েছেলেও দলে দলে এসে ঢুকছে তাঁবুর মধ্যে।

মন্তু কী যেন ভাবলো। ভেবে বললো, আহো, দেরি কইরো না, আহো।

ওর পিছুপিছু নিচে নেমে এলো টুনি। মাথার ঘোমটাটা সে একহাত লম্বা করে দিয়েছে। আর সেই ঘোমটার ভেতর দিয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকায়ে দেখছে সে।

তাঁবুর সামনে বড় বড় দুটো হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। একপাশে একদল লোক ব্যান্ড বাজাচ্ছে।

তাঁবুর দরজার ওপরে একটা মাচায় চড়ে দুটি মেয়ে ঘুরেঘুরে নাচছে। সারা গায়ে, মুখে নানা রকমের রঙ মেখেছে ওরা। টুনি অবাক হয়ে বললো, ওমা শরম করে না।

মন্তু বললো, শরম করবে ক্যান, ওরা মাইয়্যা লোক না, পুরুষমানুষ মাইয়্যা সাজছে।

অ। হা করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটার কাছ থেকে তিনআনা দামের দু-খানা টিকেট কাটলো মন্তু। ভেতরে ঢুকে দেখে ছেলে বুড়ো মেয়েতে তিলধারণের জায়গা নেই। তাঁবুর কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়লো ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির উপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেলো।

দর্শকেরা হাতে তালি দিয়ে উঠলো জোরে।

তারপর এলো বিকটাকার লোক। হাতের মুঠোর উপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির মতো ঘোরাতে লাগলো সে।

সবাই একসঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠলো।

এরপর খুব জোরে ব্যান্ড বাজলো কিছুক্ষণ।

তারপরেই এলো বাঘ। এসেই একটি হুঙ্কার ছাড়লো সে।

মন্তুর একখানা হাত ওর মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখলো টুনি। দু-চোখে ওর অপরিসীম বিস্ময়। ঘোমটার ফাঁকে একবার চারপাশে দর্শকদের দিকে তাকালো সে। তাকালো মন্তুর দিকে। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো বাঘের ওপর।

ইতিমধ্যে ভয়ে গুটিসুটি হয়ে মন্তুর বুকের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে টুনি।

মন্তু নিজেও জানে না কখন টুনিকে একেবারে কাছে টেনে নিয়েছে সে। সার্কাস শেষ হতে, দুজনের চমকে ভাঙলো। শক্ত করে ধরে রাখা মন্তুর হাতখানা মুহূর্তে ছেড়ে দিলো টুনি। তারপর মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

মন্তু নিজেও কিছুক্ষণের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।

ইতস্তত করে বললো, চলো।

ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। ঘাটে আসার পথে মনোয়ার হাজীর চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে হয়। মন্তুকে দেখে হাজী দোকান থেকে চিৎকার করে উঠলো, আরে মন্তু মিয়া কই যাও, শুন শুন।

মন্তু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো, পারলো না।

আরে মিয়া কাজের কথা আছে শুইনা যাও। দু–হাতে ওকে কাছে ডাকলো মনোয়ার হাজী।

টুনি পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। ওর দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো মন্তু। কাউন্টারের আরো অনেকগুলো লোক কথা বলছিলো।

হঠাৎ মনোয়ার হাজী শব্দ করে হেসে উঠে বললো, বাহরে বাহ্ বিবিজানেরে সঙ্গে নিয়ে সার্কাস দেখবার আইছ বুঝি?

সঙ্গেসঙ্গে আটজোড়া চোখ অদূরে দাঁড়ানো টুনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো।

মন্তু কিছু বলবার আগেই মনোয়ার হাজী সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, কহন করলা, অ্যাঁ? একবার খবর দিলা না। দাওয়াত করলা না এইডা কেমন কথা?

হতবুদ্ধি মন্তু কী বলবে কিছু ভেবে পেলো না, সে শুধু ইতস্তত করে একবার মনোয়ার হাজীর দিকে, আরেকবার টুনির দিকে তাকালো বারকয়েক। এক বিচিত্র অনুভূতির আবেশে মনটা ভরে উঠেছে ওর।

মনোয়ার হাজী শুধালো, কোনো কাজ কাম নাইতো?

একটা ঢোক গিলে মন্তু বললো, কিছু চুড়ি কিনন লাগব।

হ্যাঁ, তা কিনবা না, নিশ্চয়ই কিনবা। একগাল হাসলো মনোয়ার হাজী। তারপর বললো, এহন চলো মিয়া ভাবীরে নিয়া আজকার রাতে আমাগো বাড়ি মেহমান অইবা।

মন্তু পরক্ষণে বাধা দিলো, না না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরন লাগবো।

ওর কথাটা কানে নিলো না মনোয়ার হাজী। সে জানালো, থাকার কোনো অসুবিধে হবে না ওদের। বাড়িতে ঘর আছে অনেকগুলি, তারই একটিতে সুন্দর করে বিছানা পেতে দেবে। তাতে যদি মন্তুর আপত্তি থাকে, তাহলে আরও একটা ভালো বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মনোয়ার হাজী। সার্কাস–পার্টির ওখানে হোটেল উঠেছে কয়েকটা। এক–একটা ঘর একটাকায় একরাতের জন্যে ভাড়া দেয় ওরা। সেখানেও ইচ্ছে করলে থাকতে পারে মন্তু। পান–খাওয়া দাঁতগুলো বের করে মনোয়ার হাজী বললো, আরে মিয়া, নতুন বউ নিয়া যদি একটু ফুর্তি না কইরবা তাইলে চলে কেমন কইরা। এইতো বয়স তোমাগো।

এই শীতেও ঘামিয়ে উঠেছে মন্তু। টুনির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো, ও ভীষণ বিব্রত বোধ করছে।

ক্ষণকাল পর মন্তু বললো, আরেকদিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহমান হমু। আজকা যাই।

ওরা আমন্ত্রণ রক্ষা না–করার জন্যে কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করলো মনোয়ার হাজী। অবশেষে বললো, আরেকদিন কিন্তুক আইবা মিয়া। আর হ্যাঁ, ভাবী সাহেবেরে সঙ্গে নিয়া আইবা কিন্তুক। বলতে বলতে টুনির দিকে তাকালো হাজী।

জোয়ার পড়ে যাওয়ায় ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। যেখানে নৌকোটা বেঁধে রেখে গিয়েছিলো সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে ওটা। মাঝখানের জায়গাটা পানি আর কাদায় ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। ওর ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে অতি সাবধানে আঙুলের নখগুলো দিয়ে মাটি চেপে রাখতে হয়। নইলে যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নিচে নামতে গিয়ে অন্ধকারে মন্তুর ফতুয়াটার একটি কোণ শক্ত করে ধরে রেখেছে টুনি। একটু অসতর্ক হতে পা পিছলে যাচ্ছিলো সে। মন্তু ধরে ফেললো। মাথার আঁচলটা কাঁধের উপরে গড়িয়ে পড়লো, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করলো টুনি। কাঁধের ওপর থেকে ওর মুখখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে মন্তু সহসা অনুভব করলো, টুনির দু-চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে কাঁদছে টুনি।

ভাটিগাঙে নাও ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে বসে রইলো মন্তু। মনটা আজ ভীষণ ভেঙে পড়েছে ওর। সারা দেহে আশ্চর্য এক অবসাদ। সেদিন রাতে রসের কলসটা ভেঙে ফেললো টুনি, তখনও এত খারাপ লাগেনি ওর। আজ কেমন একটা ব্যথা অনুভব করছে সে। বুকের নিচটায়। কলজের মধ্যে।

নৌকোর ছইয়ের ভেতরে চুপচাপ বসে রয়েছে টুনি। একটা কথা বলছে না সে, একটু হাসছে না।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরলো মন্তু।

বন্ধু রে আশা ছিলো মনে মনে প্রেম করিমু তোমার সনে।
তোমারে নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।
ও পরান বন্ধুয়ারে ॥

নদীর স্রোত নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। যেন বহুদিনের এই স্নেহের টানকে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্যে প্রাণহীন কাঠের টুকরোগুলোকে গভীর আবেগে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা। টুনি এখনো নীরব।

খালের মুখের কাছে নৌকো থামাতে হলো।

ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। পাতা পানিতে নৌকো নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এখানে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ-না আবার জোয়ার আসে। জোয়ারের স্রোতে নৌকো নিয়ে ভেতরে চলে যাবে মন্তু। কিন্তু সে এখনো অনেক দেরি। ভোর রাতের আগে জোয়ার আসবে না।

নৌকো থামাতে দেখে টুনি এতক্ষণে কথা বললো, কি, নাও থামাইলা ক্যান ?

হঠাৎ নিজের অজান্তে একটা কথা বলে বসলো মন্তু। বললো, বাড়ি যামু না। এইহানে থাকুম আমরা।

ক্যান। ক্যান ? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো মন্তু। ওর হাসিটা কাটা বাঁশের বাঁশির মতো শোনাল। নৌকো থেকে নোঙরটা তুলে নিয়ে নিচে নেমে গেলো মন্তু। ভালো করে মাটিতে পাতলো ওটা। নইলে জোয়ারের প্রথম ধাক্কায় মাঝনদীতে চলে যাওয়ার ভয় আছে। তারপর পা-জোড়া ধুয়ে নিয়ে নৌকোয় উঠতে উঠতে টুনির প্রশ্নের উত্তর দিলো মন্তু।

জোয়ার না-আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

এইহানে ? বলতে গিয়ে চারপাশে তাকালো টুনি।

আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় অথৈ পানির ঢেউ। নদী এখানে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে দূর সাগরের দিকে। কয়েকটা জেলে-নৌকো মাঝ-

নদীতে টিমটিম বাতি জ্বালিয়ে জলে পাহারা দিচ্ছে। মাঝেমাঝে একে অন্যকে জোর গলায় ডাকছে ওরা। নিশির বাপ জাইগা আছনি, ও নিশির বাপরে কুই-কুই।

পশ্চিমে চর পড়েছে। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে কোনো লোকালয় নেই। শুধু বালু আর বালু। তার উপরে আরো এগিয়ে গেলে সীমাহীন বুনো ঘাসের বন। দিনের বেলায় অসংখ্য গরু-বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেরা আসে এখানে, রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকে সমস্ত প্রান্তর। পুবে, ফেলে আসা নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে শান্তির হাটের দিকে।

উত্তরে খাল। খালের পাড়ে অসংখ্য বুনো ফুলের বন। একটু ভালো করে তাকালে ওপারে তৈরি লম্বা সাঁকোটা নজরে আসে এখান থেকে। চারপাশে একপলক তাকিয়ে চুপ করে গেলো টুনি।

ও মাঝি। মাঝি-ও-কু-ই। জেলে-নৌকো থেকে কে যেন ডাকলো, কোন্‌হানের নাও, অ্যাঁ?

গলা চড়িয়ে মন্তু জবাব দিলো, পরীর দীঘি।

জবাব শুনে চুপ করে গেলো জেলেটা।

এতক্ষণ নৌকা বেয়ে আসছিলো বলে শীতের মাত্রাটা বুঝে উঠতে পারেনি মন্তু। তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে এসে ঢুকলো সে।

টুনি নড়েচড়ে একপাশে সরে গেলো।

ছইয়ের সঙ্গে ঝোলানো হুঁকো আর কল্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিল মন্তু। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এসে গলুয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগলো। দক্ষিণ থেকে কনকনে বাতাস বইছে জোরে।

আকাশে মেঘ।

মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝেমাঝে উঁকি দিয়ে আবার মুখ লুকুচ্ছে তাড়াতাড়ি।

টুনি ডাকলো। ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহো।

মন্তু কোনো জবাব দিলো না। আপন মনে হুঁকো টানতে লাগলো সে। টুনি আবার ডাকলো, আহো না, বাইরে ঠাণ্ডা লাগবো। মন্তু নীরব।

আইবা না? টুনির কণ্ঠে অভিমান।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে নিলো টুনি।

চলো, ভেতরে গিয়া শুইবা।

এবার আর কোনো বাধা দিলো না। নিঃশব্দে ছইয়ের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লো সে। ওর গায়ের উপর কাঁথাটা টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইলো টুনি।

বাইরে কনকনে বাতাস শূন্য-প্রান্তরের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলো।

ভোরে গ্রামে এসে পৌঁছলো ওরা।

মন্তু আর টুনি।

পরীর দীঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর।

দূর থেকে দেখে বুক কেঁপে উঠলো তার। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কে মরলো?

ঘোমটার নিচে থেকে টুনিও চোখ বড় বড় করে দেখছিলো কবরগুলো। পথে আসতে মাঝি-বাড়ির কুদ্দুছের সঙ্গে দেখা হতে সব শুনলো মন্তু। প্রথম কবরটা এ গাঁয়ের তোরাব আলীর। আশির উপরে বয়স হয়েছিলো ওর। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চলাফেরা করতে পারতো না।

মরে বেঁচেছে বেচারা। নইলে আরো কষ্ট সহ্য করতে হতো।

দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিলো। প্রায় রক্তবমি করতো। বুড়োরা বলতো, শত্রুপক্ষ কেউ নিশ্চয় তাবিজ করেছে, নইলে অমন হবে কেন।

তার পাশের কবরটা হালিমার। আবুলের বউ হালিমা। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল মন্তুর।

হালিমার মৃত্যুর সংবাদে কাঁদতে শুরু করেছে টুনি। ঘোমটার নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

ইতস্তত করে মন্তু বললো, কান্দ ক্যান, কাইন্দা কী অইব।

বাড়ি ফিরে এলে বুড়ো মকবুল গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলো। একদিন নয়, দুদিন নয়, চার চারটে দিন। দুশ্চিন্তায় বারবার ঘর-বার করেছে সে। আইতে এত দেরি অইলো ক্যান? অ্যাঁ।

মন্তু খুলে বললো সব। কুটুমবাড়িতে গিয়ে কুটুম যদি আসতে না দেয় তাহলে কী করতে পারে সে? তাছাড়া নদীতে যে জোয়ার-ভাটা আসে সেটাও কারো ইচ্ছেমতো চলে না। তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে ওদের।

মকবুল শুনলো সব, শুনে শান্ত হলো। তারপর, কোদালটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়ির উপরের ক্ষেতটার দিকে চরে গেলো সে। যাবার পথে আমেনা আর ফাতেমাকে ডেকে গেলো মকবুল। মাটি কুপিয়ে সমান করে মরিচের চারা লাগাতে হবে।

## ॥ আট ॥

দেখতে-না-দেখতে হীরনের বিয়ের দিনটা ঘনিয়ে এলো।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোনো কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল।

সাড়ে আট টাকা দাম দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে সে। হাট থেকে চিকন চাল কিনে এনেছে আর আধসের ঘি।

মিয়া-বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনেমাটির পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এলো আমেনা। বরপক্ষের লোকদের মাটির বাসনে খেতে দিলে ফিরে গিয়ে হয়তো বদনাম করবে ওরা, তাই।

বুড়ো মকবুলের শরীরটা ভালো নেই। চারিদিকে ছুটোছুটি করবে সে শক্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাড়ির অন্য সবার ওপরে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছে। সুরত আলী, রশীদ, আবুল, মন্তু সবাই ব্যস্ত। বুড়ো শুধু দাওয়ায় একখানা পিঁড়ির উপর বসে তদারক করছে সব। খোঁজখবর নিচ্ছে। ভূঁইয়া-বাড়ির ঘরের পাশের বড় মেহেদি গাছ থেকে মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।

আমেনা আর ফাতেমা, ঘরদোরগুলো লেপেমুছে ঠিক করে নিচ্ছে। পুরো উঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলছে ওরা। টুনি পুকুরঘাটে, বাসনপত্রগুলো মাজছে।

যার বিয়ে, সেই হীরন রসুইঘরের দাওয়ার চুপটি করে বসে রয়েছে আর অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার।

দুপুর রাতে পাড়াপড়শির অনেকে এলো। এলো বাচ্চাকাচ্চা মেয়েছেলের দল। দুখানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে উঠোনে বসলো ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে সুর করে গান ধরলো ঃ

মেহেদি তোমরা লাগো কোন্ কাজে।
আমরা লাগি দুলহা কইন্যার সাজে ॥

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে। বিয়ের ধান ভানতে এসেছে সে। সন্ধে থেকে ঢেঁকির উপর উঠেছে ও আর টুনি। তখন থেকে একমুহূর্তের বিরাম নেই। উঠোনে মেয়েরা গান গাইছিলো। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যে টুনি আর আম্বিয়া দুজনে গলা ছেড়ে গান ধরলো ঃ

ভাটুইয়ে না দিয়ো কলা
ভাটুইর হইবে লম্বা গলা।
সব লইক্ষণ কাম চিক্কণ পঞ্চ রঙের ভাটুইরে।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠল বুড়ো মকবুল। ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে আজ। জোরে জোর হুঁকো টানছে, আর চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।

হীরনকে মাঝখানে বসিয়ে ওর হাতে মেহেদি দিচ্ছে সবাই। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে বসে আছে মেয়েটা।

সুরতের ছেলেমেয়ে— কুদ্দুছ, পুটি, বিন্তি—ওরা হাতে মেহেদি দেবার জন্যে কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ধমকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো সালেহা।

মকবুল বললো, আহা তাড়াও ক্যান বউ। একটুখানি মেহেদি ওগোও দাও না।

হঠাৎ ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো। আঁচল দুলিয়ে, কোমর ঘুরিয়ে ঘুরেঘুরে নাচতে লাগলো সে।

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।
আবের পাঙ্খা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।
ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর।

ওর নাচ দেখে ছেলে বুড়ো সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো একসঙ্গে। ধান ভানা বন্ধ করে টুনি আর আম্বিয়াও বাইরে বেরিয়ে এলো। আম্বিয়াকে আসতে দেখে নাচ থামিয়ে তার দিকে দৌড়ে এলো ফকিরের মা, হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলো দলের মাঝখানে। তারপর ওকে লক্ষ করে ফকিরের মা গাইলো ঃ

কেমন তোমার মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।
এত বড় মাইয়া অইছ না করাইছে বিয়া।

ওর গানটা শেষ না–হতেই আম্বিয়া নেচে উঠে গানের সুরে জবাব দিলো ঃ

কেমন ওরে মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া
তোমার মতো কাঞ্চন পাইলে এখন করি বিয়া।

দূর পোড়া কপাইল্যা, দূর দূর বলে ওকে তাড়া করলো ফকিরের মা। দৌড়ে গিয়ে মন্তুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ারে খিল দিলো আম্বিয়া। বাইরে ছেলে–বুড়োদের রোল পড়েছে তখন।

সালেহা হেসে বললো, কিরে আম্বিয়া, এত ঘর থাইকতে শেষে আমাগো মন্তু মিয়ার ঘরে ঢুইকা খিল দিলি ?

আরেক প্রস্থ হেসে উঠলো সবাই।

মন্তু তখন উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকে দেখে গ্রামের রসুর নানি তার ফোকলা দাঁত বের করে একগাল হেসে বললো, কি মিয়া, ডুইবা ডুইবা পানি খাও। ঘরে গিয়া দেহো কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে।

মন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছিলো না। হঠাৎ টুনির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সবাই।

তীব্র গলায় সে বললো, কী অইতাছে অ্যাঁ ? কী অইতাছে। কামকাজ ফালায়া কী শুরু করছ তোমরা। অ্যাঁ ?

সহসা সবাই চুপ করে গেলো। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ওরা।

টুনি ততক্ষণে রসুইঘরের দিকে চলে গেছে।

মন্তু নির্বাক।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আম্বিয়া। তার চোখমুখ পাকা লঙ্কার মতো লাল। চিবুক আর গলা বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। কিছুক্ষণের জন্য সবাই যেন কেমন একটু স্তব্ধ হয়ে গেলো। একটু আগেকার সেই আনন্দ-উচ্ছল পরিবেশটা আর এখন নেই। ফকিরের মা বিড়বিড় করে বললো, এমন কী কইরছি যে রাগ দেহান লাগছে। বিয়াবাড়ির মইধ্যে হৈচৈ না কইরা কি কান্দাকাটি করমু ?

সালেহা বললো, আমরা নাহয় মন্তু মিয়া আর আম্বিয়ারে নিয়া একটুখানি ঠাট্টামস্করা কইরতাছিলাম, তাতে টুনি বিবির এত জ্বলন লাগে ক্যান।

ওর কথা শেষ না-হতে ঝড়ের বেগে রসুইঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। কী কইল্যা অ্যাঁ ? চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ওর। চোখজোড়া জ্বলছে।

সালেহা সঙ্গেসঙ্গে বললো, যা কইবার তা কইছি, তোমার এত পোড়া লাগে ক্যান। বলে মুখ ভ্যাংচালো সে।

পরক্ষণে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো টুনি। সালেহার চুলের গোছাটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো। তারপর চোখেমুখে কয়েকটা এলোপাতাড়ি কিলঘুসি মেরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো টুনি। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সালেহা। মনে হলো এ মুহূর্তে ওর মা মারা গেছে। কান্না শুনে এঘর-ওঘর থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে।

মকবুল দাওয়া থেকে চিৎকার করে উঠলো, কিরে কী অইলো অ্যাঁ। কী অইলো।

রশীদ, সুরত সবাই ছুটে এলো সেখানে।

রশীদ বললো, কি, কান্দবি না কইবি কিছু, কী অইছে ?

সালেহা কোনো জবাব দিলো না।

ফকিরের মা বুঝিয়ে বললো সব।

সালেহার কোনো দোষ নাই। আম্বিয়া আর মন্তুকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিলো ওরা। টুনি বেরিয়ে এসে হঠাৎ সালেহাকে মেরেছে।

মাইরছে। মাইরছে ক্যান ? রশীদ খেপে উঠলো।

ওকে রাগতে দেখে আরো জোরে কান্না জুড়ে দিলো সালেহা।

বুড়ো মকবুল বিব্রতবোধ করলো। ইতস্তত করে বললো, মন্তু আর আম্বিয়া কই গেছে ?

মন্তুকে ঘরে দাওয়াতে বসে থাকতে দেখা গেলো। কিন্তু আম্বিয়াকে পাওয়া গেলো না সেখানে। এই গণ্ডগোলের মধ্যে নীরবে এখান থেকে সরে পড়েছে সে।

ফকিরের মা বললো, ওগো কোনো দোষ নাই।

কী ভেবে বুড়ো মকবুল একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। আস্তে করে বললো, তোমরা আর হৈচৈ কইরো না। বিয়ের সময় এইসব ভালা না। যা অইছে তার বিচার আমি করমু। খাঁটি বিচার করমু আমি। বলে দাওয়ার দিকে চলে গেলো সে। তারপর হুঁকোটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বললো, কই তোমরা চুপ কইরা রইলা ক্যান, গীত গাও, হ্যাঁ, গীত গাও।

ছেলে বুড়োরা আবার হৈ চৈ করে উঠলো।

ফকিরের মা আবার গান ধরলো।

এক বাটা পান এনে ওদের সামনে নামিয়ে রেখে গেলো আমেনা। বললো, খাও।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুরনো আবেশটা ফিরে এলে আবার। ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো।

কেমন তোমার মাও বাপরে কেমন তোমার হিয়া।
এত বড় ডাঙ্গর অইছো না করাইছে বিয়া॥

বিয়ের জন্যে কিনে আনা ছাগলটা ঘরের পেছনে বেঁ-বেঁ করে ডাকছে। চোখের কোণজোড়া পানিতে ভিজে উঠেছে ওর।

ভোর রাত পর্যন্ত কেউ ঘুমালো না।

তারপর একজন-দুজন করে যায়-যার ঘরে চলে যেতে লাগলো। মন্তু সবে তার ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেবে এমন সময় বাইরে ধাক্কা দিলো টুনি। ও কিছু বলার আগে ভেতরে এসে ঢুকলো সে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল করে এসেছে। মুখে একটা প্রসন্ন হাসি, হাতে মেহেদি। সঙ্গে একটা মাটির বাটিতে করে আরো কিছু মেহেদি এনেছে সে।

বাটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টুনি আস্তে করে বললো, দেহি তোমার হাত দেহি।

মন্তু বললো, ক্যান?

টুনি বললো, তোমারে মেহেদি দিমু।

মন্তু বললো,.না।

টুনি বললো, না ক্যান— বলে ওর হাতটা টেনে নিলো সে। মাটিতে বসে ধীরেধীরে ওর হাতে মেহেদি পরিয়ে দিতে লাগলো টুনি। মন্তু কোনো বাধা দিলো না। নীরবে বসে শুধু তাকে লক্ষ করে মৃদু হাসলো।

কিছুক্ষণ পরে টুনি আবার বললো, আমার একডা কথা রাইখবা?

কি?

একডা বিয়া কর।

হুঁ।

দুজনে আবার চুপ করে গেলো ওরা।

ওর দুহাতের তালুতে সুন্দর করে মেহেদি পরিয়ে দিতে দিতে টুনি আবার বললো, আরেকডা কথা রাইখবা?

কি?

আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না।

হুঁ। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো মন্তু। টুনি পরক্ষণে ওর হাতটা কোলের ওপরে টেনে নিয়ে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, কথা দিলা? বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকালো টুনি।

মন্তু কী বলবে ভেবে পেলো না। বার-কয়েক ঢোক গিললো সে। তারপর হঠাৎ করে বললো, শাপলা তুলতা যাইবা?

মৃদু হেসে মাথা নাড়ালো টুনি। না।

তাইলে চলো, মাছ ধরি গিয়া।

টুনি আরো জোরে মাথা নাড়ালো, না।

না ক্যান? মন্তুর কণ্ঠে ধমকের সুর।

টুনি হেসে বললো, লোকে দেইখা ফেলাইলে কেলেঙ্কারি বাধাইবো। বলে উঠে দাঁড়ালো সে। মন্তুকে কথা বলার কোনো সুযোগ না-দিয়ে পরক্ষণে সেখান থেকে চলে গেলো টুনি।

বিয়ের পরে ক'টা দিন বাড়িটা একেবারে জনশূন্য মনে হলো। ছেলে বুড়ো প্রায় সবাই চলে গেছে হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ি। শুধু যায়নি মকবুল আর মন্তু।

মকবুল যায়নি তার অসুখ বলে। প্রায় বিকেলে জ্বর আসছে ওর। সকালে একেবারে ভালো।

মন্তুরও শরীরটা ভালো নেই। বিয়ের দিন, রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে সে। বুড়ো মকবুল বলেছে, থাক, তোর গিয়া কাজ নাই। তুই পরে যাইছ।

তাই থেকে গেছে সে।

বাড়ির মেয়েছেলেরা ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে খুব। বিয়ের সময়ে দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি কেউ, তাই।

বুড়ো মকবুল সাবধান করে দিয়েছে ওদের, অমন করে ঘুমায়ো না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো।

আর আইলেই বা কী নিবো। আছেই বা কী। আমেনা শান্তস্বরে জবাব দিয়েছে। ওর মনটা ভালো নেই। একমাত্র মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। বড় একা-একা লাগছে। কে জানে স্বামীর বাড়ি গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করছে হীরন।

আজ সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে ফকিরের মা। মৃত ছেলেটার কথা মনে পড়েছে ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো সে এখন বিয়ের বয়সী হতো।

জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল পুকুরপাড়ে বসে বসে মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। ফাতেমা দু-বার এসে ডেকে গেছে ওকে, আপনের কী অইছে। এইরকম কাজ কইরলে তো দুইদিনে মরবেন আপনে।

কথাটা কানে নেয়নি মকবুল। একমনে পানি ঢালছে সে।

মন্তুকে পাঠিয়েছে গাঁয়ের কোবরেজ মশায়ের কাছে। লক্ষণ বলে ঔষধ নিয়ে আসার জন্যে।

উঠোনে টুনিকে ডেকে তার হাতে ঔষুধগুলো দিয়ে দিলো মন্তু। বললো, কোবিরাজ মশায় কইছে, এইগুলান ঠিকমতো খাইতে।

টুনি ঔষুধগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বললো, কী অইবো ওষুধ খাইয়া, বুড়া মরুক। বলেই চারপাশে তাকালো টুনি, কেউ শুনলো কিনা দেখলো। মন্তু কোনো জবাব দিলো না ও-কথার। বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে রসুইঘরের দিকে চলে গেল সে।

একটু পরে একবাটি তেঁতুল-মরিচ মেখে এনে মন্তুর সামনে বসলো টুনি। অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধালো, খাইবা?

বাটিটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে মন্তু বললো, না। তারপর একমনে হুঁকো টানতে লাগলো সে।

টুনি বললো, কোবিরাজ কী কইছে?

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মন্তু জবাব দিলো, কইছে, কিছু না, ভালা অইয়া যাইবো।

ভালো অইয়া যাইবো? চোখজোড়া কপালে তুললো টুনি।

নেড়ি কুকুরটা টুনিকে কিছু খেতে দেখে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলো। হঠাৎ দাওয়া থেকে পিঁড়ি তুলে ওর গায়ে ছুড়ে মারলো টুনি। সারাদিন কেবল পিছে পিছে ঘুরে, কোনোহানে গিয়া একটু শান্তি নাই।

পিঁড়ির আঘাতে কেঁউ কেঁউ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো কুকুরটা।

॥ নয় ॥

চৈত্র মাসের রোদে পুরো মাঠটা খা খা করছে।

যেদিকে তাকানো যায় শুধু শুকনো মাটি। পাথরের চেয়েও শক্ত। আর অসংখ্য ফাটল। মাটি উত্তাপ সহ্য করতে না-পেরে ফেটে যায়। দাঁড়কাকগুলো তৃষ্ণায় সারাক্ষণ কা-কা করে উঠে বেড়ায় এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। বাড়ির আনাচে কানাচে।

নদী-নালাগুলোতে পানি থাকে না। মানুষ গরু ইচ্ছেমতো পায়ে হেঁটে এপার-ওপার চলে যায়। পুকুরগুলোর পানিও অনেক কমে আসে।

গরমে ঘরে থাকে না কেউ। গাছের নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে-বসে দিন কাটায়। বাতাসে একটি পাতাও নড়ে না। সারাক্ষণ সবাই শুধু হা-হুতাশ করে।

এমনি সময়ে হীরনকে দেখবার জন্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে গেছে বুড়ো মকবুল। যাবার সময় একটা ন্যাকড়ার মধ্যে এককুড়ি মুরগির ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে হয়তো ওরা লজ্জা দিতে পারে, তাই।

পথে বামনবাড়ির হাট থেকে চারআনার বাতাসাও কিনেছে সে। বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে।

ভর সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এলো মকবুল। বারবাড়ি থেকে ওর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, সুরত। সুরত। ও মন্তু, কেউ কি নাই নাকি রে।

মন্তু গেছে মিয়া-বাড়ি। গাছ কাটার চুক্তি নিয়েছে সে।

সুরতও সেখানে।

আবুল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ভাইসাব কী অইছে।

টুনি আর আমেনাও বেরিয়ে এলো বাইরে।

মকবুল বললো, সুরত, রশীদ ওরা কই।

আমেনা বললো, সুরত কাজে গেছে, রশীদ গেছে হাটে, সালেহার লাইগা সাবু আনতে। ওর জ্বর হইছে ভীষণ।

জ্বর নাহি, আহা কখন আইলো? গায়ের ফতুয়াটা খুলতে খুলতে মকবুল বললো, বাপু, তোমরা সক্কলে একটু সাবধানে থাইকো। ও বিত্তির মা, বঁইচির মা শোনো, তোমরা একটু সাবধানে থাইকো। গেরামে ওলাবিবি আইছে।

ইয়া আল্লাহ মাপ কইরা দাও। আতঙ্কে সবাই শিউরে উঠলো।

গনু মোল্লা ওজু করছিলো, সেখান থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, কোন্‌হানে আইছে ওলা বিবি? কোন্ বাড়িতে আইছে?

মকবুল বললো, মাঝি-বাড়ি।

মাঝি-বাড়ি? একসঙ্গে বলে উঠলো সবাই। কয়জন পড়ছে?

তিনজন।

তিনজন কে কে, সে কথা বলতে পারবে না মকবুল। পথে আসার সময় ও-বাড়ির আম্বিয়ার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে। বাড়ির সবাইকে আরেক প্রস্থ সাবধান করে দিলো বুড়ো মকবুল, তোমরা সক্কালে একডু হুইসারে থাইকো বাপু। একডু দোয়া-দরুদ পইড়ো। বলে খড়মটা তুলে ঘাটের দিয়ে চলে গেলো সে।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ নীরবে শুনেছিলো সব, এবার বিড়বিড় করে বললো, বড় খারাপ দিনকাল আইছে বাপু। যেই বাড়িডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডারে এক্কেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলাবিবি। বড় খারাপ দিনকাল আইছে। বলে নিজের মৃত ছেলেটার জন্য কাঁদতে শুরু করলো সে।

টুনি দাঁতমুখ শক্ত করে তেড়ে এলো ওর দিকে, বুড়ি, যহন তহন কান্দিছ না কইলাম। শিগগির থাম।

ধমক খেয়ে ফকিরের মা চুপ করে গেলো। সেই বিয়ের সময় সালেহাকে মারার পর থেকে টুনিকে ভীষণ ভয় করে বুড়ি।

ইতিমধ্যে মন্তু আর সুরত ফিরে এসেছে।

কাঁধের উপর থেকে কুড়োলটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে না-রাখতে টুনি একপাশে টেনে নিয়ে গেলো মন্তুকে।

মাঝি-বাড়ি যাও নাই তো?

মন্তু ঘাড় নাড়লো, না, ক্যান কী অইছে?

টুনি বললো, ওলাবিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেল ওর।

মন্তুর দু-চোখে বিস্ময়। বললো, কার কাছ থাইকা শুনছ?

ও-কথার কোনো জবাব না দিয়ে টুনি আবার বললো, শোনো ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও। যাইও না ক্যান?

মন্তু সায় দিয়ে মাথা নাড়ালো কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলো না সে। আজ সকালে মিয়া-বাড়ি যাওয়ার পথে একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে গেছে মন্তু। নৌকোটাকে ভালোভাবে মেরামত করার বিষয় অনেকক্ষণ আলাপ করে গেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন তো এমন কিছু শুনেনি সে।

আম্বিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, সেও কিছু বলেনি।

উঠোনের এককোণে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবলো মন্তু। বুড়ো মকবুলকে তামাক সাজিয়ে দেবার জন্যে রসুইঘরে গেছে টুনি। এই সুযোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো সে।

দীঘির পাড়ে নন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে দেখা হলো। পরনে লুঙি আর কুর্তা। হাতে লাঠি, বগলে একজোড়া পুরনো জুতো। মন্তুকে দেখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে তোরাব প্রশ্ন করলো, কি মিয়া খবর সব ভালো তো?

মন্তু নীরবে ঘাড় নাড়লো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কই যাও, শ্বশুরবাড়ি বুঝি?

হুঁ। তোরাব শ্বশুরবাড়িতেই যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে অনেকদিন আসতে পারেনি, খোঁজখবর নিতে পারেনি। তাই সুযোগ পেয়ে একবার সকলকে দেখে যেতে এসেছে সে।

পকেট থেকে দুটো বিড়ি বের করে একটা মন্তুকে দিয়ে আরেকটা নিজে ধরালো। বিড়ি খেতে ইচ্ছে করছিলো না মন্তুর। তবু নিতে হলো।

সগন শেখের পুকুরপাড়ে এসে থামলো তোরাব। জুতো-জোড়া বগল থেকে নামিয়ে নিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে ঘাটে নেমে গেল সে। বললো, একটুখানি দাঁড়ান মিয়া। অজু কইরা নি।

হাত–পা ধুয়ে জুতো–জোড়া পরে আবার উপরে উঠে এলো তোরাব। পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলগুলো পরিপাটি করে নিয়ে বলল, মাঝি–বাড়ির খবর জানেন নাহি, সক্কলে ভালো আছে তো?

মন্তু বললো, ভালো তো আছিলো, কিন্তুক একটু আগে শুনছি ওলা লাগছে।

ওলা। তোরাব যেন আঁতকে উঠলো। পায়ের গতিটা কমিয়ে এসে সে শুধালো, কার কার লাগছে?

মন্তু বললো, কি জানি ঠিক কইবার পারলাম না।

হুঁ। হঠাৎ থেমে গেল তোরাব। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর পায়ের জুতো–জোড়া খুলে আবার বগলে নিতে নিতে বললো, এই দুঃখের দিনে গিয়ে ওনাগোরে কষ্ট দেয়নের কোনো মানি অয় না মিয়া। যাই, ফিইরা যাই। যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালো সে। আস্তে করে বললো, আমি যে আইছিলাম এই কথাডা কেউরে কইয়েন না মিয়া। বলে মন্তুর উত্তরের অপেক্ষা না–করে যে পথে এসেছিলো সে পথে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চললো তোরাব।

হাতের বিড়িটা অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওর চলে–যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তু।

মাঝি–বাড়ি থেকে একটা করুণ বিলাপের সুর ভেসে এলো সেইমুহূর্তে। একজন বুঝি মারা গেলো। কলজেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো মন্তুর। মাঝি–বাড়ির দেউড়িটা পেরিয়ে ভেতরে আসতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠলো ওর।

নন্তু শেখ মারা গেল। হাঁপানি–জর্জর করিম শেখ মৃত বাবার দেহের পাশে বসে কাঁদছে। আম্বিয়া কাঁদছে তার বিছানায় শুয়ে। ওলাবিবি তাকেও ভর করেছে। তাই বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। সেখান থেকে কাঁদছে সে।

দাওয়ার উপরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো মন্তু।

মাঝি–বাড়ির ছমির শেখ ওকে দেখে দু–হাতে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো। এই কী মুছিবত আইলো মিয়া, আমরা বুঝি এইবার শেষ অইয়া যামু।

ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো মন্তু। তারপর ওর কাছ থেকে বাকি খোঁজখবর নিলো সে। ছোটভাই জমির শেখ কবিরাজ আনতে গেছে দু–ক্রোশ দূরে রতনপুরের হাটে। এখনো ফিরে আসেনি, ভোরের আগে যে আসবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এই একটু আগে জমির শেখ, পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাইকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বুড়োরা মরে গেলেও ছেলেমেয়েগুলো যাতে বাঁচে। নইলে বাপ–দাদার ভিটার ওপরে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। ছমির শেখের দু–গণ্ড বেয়ে পানি ঝরছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখজোড়াও ভিজে এলো ওর। আম্বিয়ার ঘরের দিকে তাকাতে দেখলো, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিলাপ করছে মেয়েটা।

পরদিন ভোরে একটা খন্তা আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মন্তু। পরীর দীঘির পাড়ে জায়গাটা আগেই দেখিয়ে গেছে ছমির শেখ। কথা ছিলো একটা কবর খোঁড়ার। এখন দুটো খুঁড়তে হবে। একটা নন্তু শেখের জন্যে, আরেকটা জমির শেখের জন্যে। রাতে কবিরাজ আনতে যাওয়ার সময় ভেদবমি শুরু হয় ওর। বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে ও।

আগে মরার জন্য কবর খোঁড়ার কাজটা নন্তু শেখ করতো। গত ত্রিশবছর ধরে এ গাঁয়ে যত লোক মরেছে, সবার জন্যে কবর খুঁড়েছে সে। কোদাল হাতে কবর খোঁড়ার

সময় প্রায় একটা গান গাইতো নন্তু শেখ। আজ ওর কবরের ছক কাটতে গিয়ে সে গানটার কথা মনে পড়ে গেলো মন্তুর।

এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।
মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

মাটি খুঁড়তো আর টেনে টেনে গান গাইতো নন্তু শেখ। বলতো, কত মানুষের কবর দিলাম, কত কবর খুঁইড়লাম এই জীবনে। তার হিসাব কি আর আছে মিয়া। এমনও দিন গ্যাছে যহন, একদিন সাত আটটা মাটি দিছি।

গোরস্থানে কোন্‌টা কার কবর। কাকে কোন্‌দিন এবং কোথায় কবর দিয়েছে সবকিছু মুখে মুখে বলে দিতে পারতো নন্তু। আর যখন কবর খুঁড়তে গিয়ে মানুষের অস্থি কিম্বা মাথার খুলি পেতো সে, তখন সবাইকে দেখিয়ে বিজ্ঞের মতো বলতো— চিনবার পার এরে ? না না তোমরা চিনবা কেমন কইরা। আমি চিনি। এইডা কলিমুল্লা মাঝির মাইয়ার খুলি। এইহানেই তো কবর দিছিলাম ওরে। আহা মাইয়া আছিল বটে একডি। যেনো টিয়াপাখির ছাও। যে একবার দেইখছে সেই আর ভুলবার পারে নাই। বলে খুলিটার দিকে খুব ভালো করে তাকাতো নন্তু শেখ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার করে দেখতো ওটা, আহা কী মাইয়া কী অইয়া গেছে। সোনার চাঁদ সুরত এহন চিনবারই পারা যায় না। অতি দুঃখের সঙ্গে নন্তু আবার বলতো, গলায় ফাঁস দিয়া মইরছিলো অভাগী। জামাইর সঙ্গে বনিবনা অইতো না, তাই। খুলিটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নন্তু বলে যেতো, সেই বহুত দিনের কথা মিয়া, তহন তোমরা সব মায়ের পেটে আছিলা।

সেই নন্তু শেখের মৃতদেহটা কবরে নামাতে গিয়ে চোখজোড়া পানিতে ঝাপসা হয়ে এলো মন্তুর। মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে অইবো কবরে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না মন্তু। দীঘির পাড়ে কাটিয়ে দিলো সে। ওর মায়ের কবরটা দেখলো। এককালে বেশ উঁচু ছিলো ওটা। অনেক দূর থেকে চোখে পড়তো। এখন মাটির নিচে খাদ হয়ে গেছে একহাঁটু। অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত নেমে গেছে ভেতরের দিকে, সেখানে মায়ের দু-একখানা হাড় হয়তো আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। মায়ের জন্যে আজ হঠাৎ ভীষণ কান্না পেলো। মনে হলো ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।

শুকনো পাতার শব্দে পেছনে ফিরে তাকালো মন্তু। টুনি দাঁড়িয়ে পেছনে। সারাদিন ওর দেখা না-পেয়ে অনেক খোঁজের পর এখানে এসেছে সে। মন্তুকে ওর মায়ের কবরের পাশে বসে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো টুনি।

তারপর ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে আস্তে করে বললো, ঘরে যাইবা চলো।

কোনো কথা না বলে নীরবে উঠে দাঁড়ালো মন্তু। কিন্তু তক্ষুনি বাড়ি ফিরলো না সে। বললো, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বললো, কই যাইবা ?

মন্তু বললো, যাও না আইতাছি। বলে টুনিকে সঙ্গে নিয়ে পরীর দীঘির পাড় থেকে নেমে এলো সে।

ও যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন বেশ রাত হয়েছে। বারবাড়ি থেকে মন্তু শুনতে পেল গনু মোল্লা ওরা বসে বসে কী যেন আলাপ করছে।

গনু মোল্লা বলছে, সব অইছে খোদার কুদরত বাপু। নইলে এই দিনে তো কোনোদিনও ওলা বিবিরে আইতে দেহি নাই।

মকবুল বললো, ওলা বিবির আইজকাল দিনকাল কিচ্ছু নাই। যহন তহন আহে।

আমেনা বললো, এক পা খোঁড়া বিবির। তবু যে কেমন কইরা এত বাড়ি-বাড়ি যায়, আল্লা মালুম।

ওর কথা শেষ না-হতেই টুনি জিজ্ঞেস করলো, কেমন কইরা ওর এক পা খোঁড়া অইল বুয়া ?

তখন টুনিকে বোঝাতে লেগে গেলো আমেনা।

ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষ্মা বিবি— ওরা ছিলো তিন বোন। তিন বোন একপ্রাণ। যেখানে যেতো একসঙ্গে যেতো ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরুতো না বাইরে।

একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো তখন হঠাৎ হজরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। রঙিন শাড়ি পরে বেরুলে কী হবে, ওদের চিনতে একমুহূর্তেও বিলম্ব হলো না হজরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন—এর একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষ্মা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কাইণ্ড কইরা বসলেন তিনি। খপ কইরা না ওলা বিবির একখান হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেলো ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত।

মকবুল সঙ্গেসঙ্গে বলে উঠলো, একখান পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুই পা থাকলে তো দুনিয়াডারে একদিন শেষ কইরা ফালাইতো। হঠাৎ মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বুড়ো মকবুল মুহূর্তে রেগে গেলো। কিরে নবাবের ব্যাটা, তোরে একশোবার কই নাই মাঝি-বাড়ি যাইস না, গেলি ক্যান অ্যাঁ ?

গনু মোল্লা বললো, আক্কেল পছন্দ নাই তো।

সুরত আলী বললো, বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালায়া দিমু তোর।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বললো, বাপু গেলেই কি অইবো, আর না গেলেই কি অইবো। যার মউত আল্লায় যেইদিন লেইখা রাখছে সেই দিন অইবো। কেউ আটকাইবার পারবো না।

ঠিক কইছেন চাচী আপনি ঠিক কইছেন। সঙ্গেসঙ্গে ওকে সমর্থন জানালো টুনি।

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানালো, গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বললো, ওই খোঁড়া কুত্তা খোঁড়া মোরগ আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে সমর্থনের জন্যে সবার দিকে একনজর তাকালো সে।

মকবুল জানালো, শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল, কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন ওলা বিবি।

হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিলো। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে-কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোনো খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলারে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও।

সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। হ্যাঁ তাই করবে।

রাতে ঘুম হলো না মন্তুর।

সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করলো সে। না, একটা বিয়ে ওকে এবার করতেই হবে। এমনি একা জীবন আর কত দিন কাটাবে মন্তু। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবতে গেল ইদানীং টুনি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতে পারে না সে। শান্তির হাটের সেই রাত্রির পর থেকে টুনি তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসে আছে।

গ্রামের কত লোক তাদের বউকে তালাক দেয়। বুড়ো মকবুল কেন তালাক দেয় না টুনিকে ?

হঠাৎ পরীবানুর পুঁথির কথা মনে পড়লো মন্তুর। সুরত আলী মাঝেমাঝে সুর করে পড়ে ওটা।

ঘর নাই বাড়ি নাই দেখিতে জবর
পরীবানুর আসিক লইল তাহারি উপর।

কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্থের বউ পরীবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হতো না। অষ্টপ্রহর ঝগড়া–বিবাদ লেগে থাকতো। ঘর ছেড়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে নীরবে বসে থাকতো সে। আর সেখান থেকে দেখতো একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বটগাছের নিচে বসে একমনে বাঁশি বাজাতো সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেলো।

তারপর।

তারপর একদিন সময় বুঝিয়া।
দুইজনে পালায়া গেলো চোখে ধুলা দিয়া।

মন্তুরও তাই মনে হলো। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোনো গ্রামে কিম্বা শহরে। শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে, তা হলে মনোয়ার হাজী নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে–কোনো দোকানে হাজীকে দিয়ে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে সে।

এমনি আরো অনেক চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুতেই আমেনা জিজ্ঞেস করলো, নন্তু শেখের বাড়ির কোনো খবর জানো?

না।

ওমা জানো না? নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখ পড়ছে আজ্।

মন্তু কোনো কথা বললো না।

আমেনা বলে চললো, কবিরাজে কিছু কইবার পারলো না। তাই ও গনু মোল্লারে ডাইকা নিছে। একটু ঝাড়ফুঁক দিয়া যদি কিছু অয়।

মন্তুকে চুপ করে থাকতে দেখে আমেনাও চুপ করে গেলো।

অবশেষে আরও আট–দশটি প্রাণ হরণ করে তবে গ্রাম থেকে বিদায় নিলেন ওলাবিবি। গ্রামের সবাই মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ পড়ালো বাড়ি বাড়ি।

ওলা বিবি গেলেন। আর দিনকয়েক পরে বৃষ্টি এলো জোরে। আকাশ কালো করে নেমে এলো অবিরাম বর্ষণ। সারারাত মেঘ গর্জন করলো। বাতাস বইলো আর প্রচণ্ড বেগে ঝড় হলো।

আগের দিন বিকেলে আকাশে মেঘ দেখে বুড়ো মকবুল তার পুরনো লাঙলটা ঠিক করে নিয়েছে। গরু নেই ওর। রওশন ব্যাপারীর কাছ থেকে একজোড়া গরু ঠিক করে নেবে। যে কদিন হাল চলবে সে কটা দিনের জন্যে ওকে নগদ টাকা দিতে হবে। তা ছাড়া গরুর ঘাস–বিচালির পয়সাটাও জুটাতে হবে তাকে।

ভোর না–হতেই বেরিয়ে পড়লো মাঠে।

আবুল, মন্তু, সুরত আলী, রশীদ, বুড়ো মকবুল আর গ্রামের সবাই। পুরুষরা কেউ বাড়ি নেই।

পুরো মাঠ জুড়ে হাল পড়েছে। পাথরের মতো শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।

হট হট হট হুঁ উঁ উঁ।

বড় মিয়ার জমিতে লাঙল নামিয়েছে মন্তু আর সুরত।

এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিল। সরেস জমি। প্রায় মণ-সাতেক ধান ফলতো তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকতো মাটিতে।

নিজ হাতে ক্ষেতে লাঙল দিতো সুরত। মই দিতো। ধান ফেলতো খুব সাবধানে। গাছ উঠলে, বসে বসে আগাছাগুলো পরিষ্কার করতো। ছাই আর গোবর ছড়িয়ে দিয়ে যেতো প্রতিটি অঙ্কুরের গোড়ায় গোড়ায়। তারপর খাজনার টাকা জোটাতে না-পেরে ওটা বড় মিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে।

আহা জমিডার কী অবস্থা কইরছে দেখছ? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বললো, জমির লাইগা ওগো আধ-পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে।

মন্তু সঙ্গেসঙ্গে বললো, গেল বৎসর মোটে দেড়মণ ধান পাইছে। কোথায় সাতমণ আর কোথায়দেড় মণ।

বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠলো সুরত আলীর। রুগ্ণ গরু দুইটাকে হট হট করে জোরে তাড়া দিয়ে বললো, জমির খেদমত করন লাগে। বুঝলা মন্তু মিয়া, জমির খেদমত করন লাগে। যত খেদমত কইরবা তত ধান দিব তোমারে।

শেষের কথাগুলো স্পষ্ট করে শোনা যায় না। আপন মনে বিড়বিড় করে সুরত। হঠাৎ কোনোখানে যদি কতগুলো টাকা পেয়ে যেতো তাহলে জমিটাকে আবার কিনে নিতো সে। তখন সাতমণের জায়গায় আটমণ ধান বের করতো সে এ জমি থেকে।

আকাশে এখনও অনেক মেঘ, দক্ষিণের বাতাসে উত্তরে ভেসে যাচ্ছে ওরা। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে নিচে। সুরত তখনো চলছে আপন মনে। খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিনগুলান বড় মিয়ারে দিয়া দিলো। জমির লাইগা যার একটুও মায়াদয়া নাই তারই দিলো খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমনতরো ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া? ইনছাফ ইনছাফ করো মিয়া, এইডা কেমনতরো ইনছাফ অইলো অ্যাঁ?

হিরর। হট হট। হুঁ উঁ উঁ। গরুগুলোর লেজ ধরে জোরে তাড়া দিলো সুরত আলী।

অদূরে রশীদ তার জমিতে ধান ফেলছে। মিশকালো দেহ বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘাম ঝরছে ওর। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে ক্ষেতের মধ্যে পড়ে যাবে সে। ওটাও বড় মিয়ার ক্ষেত। বর্গা নিয়ে চাষ করছে রশীদ। ওর পাশের ক্ষেতে মই জুড়েছে বুড়ো মকবুল। কাজ করার সময় আশেপাশের দুনিয়াকে একেবারে ভুলে যায় সে। কোথায় কী ঘটছে লক্ষ করে না। ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো। অভাইজান।

মকবুল মুখ না-তুলেই জবাব দিলো, কী, কও না।

ধান তো ফালায়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।

দাও, দাও ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ।

আর লাভের কথা কইও না। গরুজোড়ার সঙ্গে মই জুড়তে জুড়তে রশীদ জবাব দিলো। ধান বেশি অইলেই বা কী, না অইলেই বা কী। বড় মিয়াকে তো অর্ধেক দিয়া দেওন লাগবো।

ওই দিয়া-থুইয়া যা থাহে, তাই লাভ। মকবুল সান্ত্বনা দিলো ওকে।

সুরত আলী তখনও আপন মনে বলে চলেছে, পরের জমিতে খাইট্যা কোনো আরাম নাই মন্তু মিয়া, পরের জমি.... আরে গরুগুলার আবার কী অইলো। হালার নবাবের ব্যাটা। হট, হট, হুঁ উঁ উঁ।

মন্তু ততক্ষণে গান ধরেছে।

আশা ছিলো মনে মনে, প্রেম করিমু তোমার সনে
তোমায় নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে ॥

হঠাৎ গান থামিয়ে গরুজোড়ার লেজ ধরে সজোরে টান দিলো মন্তু। ইতি, ইতি, ইতি, চল।

সুরত বললো, গান থামাইলি ক্যান মন্তু। গাইয়া যা, গাইয়া যা।

মন্তু বললো, না ভাইজান গলাডা হুকাইয়া গেছে, গান বাইরয় না।

হ, হ, দুনিয়াডাই হুকাইয়া গেছে মন্তু মিয়া। তোর গলা হুকায় নাই। জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সুরত আলী। আমাগো জমানায় আহা, কত গান গাইছি, কত ফুর্তি কইরছি। কত রংবাজি দেইখছি। আর অহন দুনিয়াডাই আরেক রকম অইয়া গেছে মন্তু মিয়া। গাজি কালুর দুনিয়া আর নাই। সোনাভানের দুনিয়া পুইড়া ছাই অইয়া গেছে। বলে কর্কশ গলায় সে নিজে একখানা গান ধরলো।

যা ছিলো সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।
ও খোদা,
আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন্ রোষে।

গান গাইতে গাইতে খুকখুক করে অনেকক্ষণ কাশলো সুরত। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো। থাম থাম আরে থামরে নবাবের বেটা। থা। গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্যে আলোর ধারে এসে বসলো সে। বললো, মন্তু মিয়া আহো, তামুক খাইয়া লও।

তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও ক্ষেত ছেড়ে উঠে এলো। জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বুড়ো মকবুলের দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিলো সুরত।

প্রথমে একনিশ্বাসে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো মকবুল। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, মন্তু মিয়া তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আইজ সইন্ধ্যা বেলা বাড়ি থাইকো।

রশীদ আর সুরত একবার হুঁকোর দিকে তাকালো। কিছু বললো না। ওদের নজর এখন হুঁকোর দিকে।

সন্ধেবেলা বুড়ো মকবুলের কাছ থেকে কথাটা শুনলো মন্তু। ওর বিয়ের কথা।

মকবুল ঠিক করেছে এবার সত্যিসত্যি একটা বিয়ে করিয়ে দেবে মন্তুকে। চাচা চাচী এতদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই বিয়ে দিয়ে দিতেন। চাচা নেই। মকবুল বেঁচে আছে। বাড়ির মুরুব্বি সে। এ ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব রয়েছে।

পাত্রী ঠিক করে নিয়েছে মকবুল। মাঝি–বাড়ির আম্বিয়া।

নন্তু শেখ আর তার ছেলে করিম শেখ কলেরায় মারা যাবার পর থেকে আম্বিয়া একা। বসতবাড়িটা, বাড়ির ওপরের ছোট্ট ক্ষেতটা আর সেই নৌকোটার এখন মালিক সে। ওকে বিয়ে করলে মন্তু অনেকগুলো সম্পত্তি পেয়ে যাবে একসঙ্গে।

রশীদ তার ঘরের চালায় খড় দিয়ে ফুটোগুলো মেরামত করছিলো। তাকে ডাকলো মকবুল। তোমরা এইটার একটা ফয়সালা কইরা ফালাও মিয়া। ওই মাইয়া বেশিদিন থাকবো না। বহু লোকের চোখ পইড়ছে।

চালার উপর থেকে রশীদ বললো, মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সক্কলের হাঁপানির অইবো।

মকবুল সঙ্গেসঙ্গে বললো, আরে একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয়তো তালাক দিয়া দিবো।

মন্তু সহসা কিছু বললো না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিলো তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলতো তাহলে তক্ষুনি রাজি হয়ে যেতো সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।

বুড়ো মকবুল বললো, অমন সম্বন্ধ আর পাইবি না মন্তু। চিন্তা করার কিছু নাই। মত দিয়া দে। কাইল রাইতে গিয়া ওর চাচা ছমির শেখের সঙ্গে আলাপ কইরা আহি।

ফকিরের মা বললো, আপনেরা মুরুব্বি, আপনেরা ঠিক কইরা ফালান।

আমেনা বললো, ঠিক কথা কইছ চাচী।

মন্তু তখনও ভাবছে।

একটা বসতবাড়ি। একটা নৌকো। আর বাড়ির ওপরে একটুকরো ক্ষেত। দেখতেও সুন্দরী সে। আঁটসাঁট দেহের খাঁজে খাঁজে দুরন্ত যৌবন আটহাত শাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেটে পড়তে চায়।

বুড়ো মকবুল বললো, তাইলে ওই কথাই রইলো। কাইল রাইতের বেলা ওর চাচার সঙ্গে আলাপ করি গিয়া।

মন্তু চুপ করে রইলো। তারপর খুব আস্তে করে বললো ও, আপনেরা যেইডা ভালো মনে করেন। করেন।

মুখ-তুলে তাকাতে পারলো না সে। রসুইঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি। দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটছে সে। মন্তুর কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। বললো, আমাগো মন্তু মিয়ার বিয়ায় কিন্তুক বড় দেইখ্যা একখান পাল্কি আনন লাগবো।

ফকিরের মা বললো, মাইয়া এমন কইরা হাসতাছে য্যান ওর বিয়ার কথা অইতাছে, দেহ না কারবার।

ওর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে পরমুহূর্তে সেখান থেকে সরে গেলো টুনি।

বিয়ের কথা শুনে সুরত আলী আর আবুলও সমর্থন জানালো। গনু মোল্লা বললো, ভালা অইছে। মন্তু এইবার সংসারী অইবো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টুনি মকবুলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললো, আপনের সঙ্গে আমার একডা কথা আছে।

মকবুল রেগে উঠলো। এই রাতের বেলা এখন ঘুমোতে যাবে। এই সময়ে আবার এমন কী কথা বলতে চায় টুনি। রেগে বললো, কাইল দিনের বেলা কইয়ো।

টুনি বললো, না অহনি কওন লাগবো।

বুড়ো মকবুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো, আচ্ছা কও কী কথা।

চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরেধীরে কথাটা বললো টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগটা কেন হেলায় হারাচ্ছে সে। একটা বসতবাড়ি। একটা ক্ষেত । আর একটা নৌকো। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আম্বিয়াকে।

বুড়ো মকবুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ও সম্ভাবনার কথা সে নিজেও ভাবেনি এর আগে। টুনি যা বললো, শুধু তাই নয়। আরো লাভ আছে আম্বিয়াকে বিয়ে করায়। সারাদিন একটানা ধান ভানতে পারে সে। খাটতে পারে অসম্ভব।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, চিন্তা কইরতাছ কী, চিন্তা করার কিছুই নাই।

এ মুহূর্তে টুনিকে ওর নিজের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হলো মকবুলের। মনে হলো টুনির কাছে নেহায়েত একটা শিশু সে।

একটু পরে চাপা গলায় মকবুল বললো, বড় বউ আর মাইঝা বউ যদি রাজি না অয় ?

টুনি বললো, রাজি অইবো না ক্যান। নিশ্চয় অইবো।

মকবুল বললো, ওগো না অয় রাজি করন গেল। কিন্তুক আম্বিয়া ?

মকবুলের কণ্ঠস্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা।

টুনি বললো, চেষ্টা কইরলে সব অয়, অইবো না ক্যান ?

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো ওরা। মকবুল বললো, বহ বউ। বহ।

টুনি বসলো ওর পাশে। দুজনে পাশাপাশি। মকবুলের কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইলো ওরা।

বাড়ির বাচ্চাকাচ্চাদের উঠোনে বসিয়ে কিচ্ছা বলছে ফকিরের মা। চাঁদ সওদাগরের কিচ্ছা। একমনে হা করে শুনছে সবাই।

সালেহা কাঁদছে ওর ঘরে। কাল দুপুরে ওর মুরগিটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে ধরে। সেই শোকে কাঁদছে সে।

আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে কথাটা বললো বুড়ো মকবুল।

শুনে আমেনা সঙ্গেসঙ্গে প্রতিবাদ করলো, এমন কী অভাব আছে আপনের যে ওকে বিয়ে করতে চান ?

ফাতেমা বললো, এই বুড়া বয়সে মাইনষে কইবো কী ?

টুনি বললো, মাইনষের কথা হুইনা কী অইবো। মাইনষে তো অনেক কথা কয়।

তবু ফাতেমা আর আমেনা ঘোর আপত্তি জানালো। মকবুল অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলো ওদের। কিন্তু ওরা রাজি হলো না।

অবশেষে মকবুল রেগে গেলো, শাসিয়ে বললো, অত কথা বুঝি না। আম্বিয়ারে বিয়া আমি করমুই। তোমরা পছন্দ করো কি না করো।

কথাটা চাপা থাকলো না।

পরদিন বাড়ির সবাই জেনে গেলো ব্যাপারটা।

মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে মকবুল।

কথাটা আমেনা আর ফাতেমার কাছ থেকে শুনেছে সবাই।

মন্তু রীতিমতো অবাক হলো।

সালেহা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললো, ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। মাইনষে হুনলে কইবো কি ?

ফকিরের মা বললো, মকবুল মিয়ার এইডা উচিত অয় নাই। যাই কও মিয়া, এইডা উচিত অয় নাই।

আমেনা আর ফাতেমা দুজনে মিলে গনু মোল্লার কাছে কাঁদাকাটি করেছে। বলেছে, মানষে হাসাহাসি কইরবো। আপনে ওনারে বাধা দ্যান। আপনের কথা ওনি হুনবেন।

সুরত আর আবুলকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করলো গনু মোল্লা। বললো, বাড়ির বদনাম অইয়া যাইবো।

শুনে সুরত আলী আর আবুল দুজন খেপে উঠলো। এইসব কি অ্যাঁ, বুড়ার কি ভীমরতি অইছে নাহি ?

আবুল বললো, বুড়া বয়সে এইসব কী পাগলামি শুরু অইছে।

কিছু বললো না শুধু মন্তু।

রাতে গনু মোল্লার ঘরে জমায়েত হলো সবাই।

রশীদ এলো। আবুল এলো। সুরত আলী, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, ফকিরের মা সবাই এলো।

এলো না শুধু মন্তু, টুনি, আর যাকে নিয়ে বসা— সেই বুড়ো মকবুল। মকবুল তার ঘরের মধ্যে নীরবে বসে রইল।

সবকিছু সেও শুনেছে।

গনু মোল্লার ঘরে ওরা কেন জমায়েত হয়েছে সব বুঝতে পেরেছে সে। এর মূলে আমেনা আর ফাতেমা। ওর দুই স্ত্রী। যাদের এতদিন খাইয়েছে পরিয়েছে সে। নিমকহারাম, এক নম্বরের নিমকহারাম। চাপা আক্রোশে গর্জাতে লাগলো বুড়ো মকবুল।

টুনি বললো, ওগো হিংসা অইতাছে। ওরা চায় না আপনে সম্পত্তির মালিক অন।

টুনি ঠিক বলেছে, বাড়ির কেউ চায় না ও আম্বিয়াকে বিয়ে করুক। বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না।

এক ছিলিম তামুক সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিলো টুনি। বললো, মাথা গরম কইরেন না। এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখন লাগে।

গনু মোল্লার ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ সাহস করলো না। আবুল বললো সুরতকে যেতে। সুরত বললো ফকিরের মার কথা। ফকিরের মা ভয়ে আঁতকে উঠে বললো, ওরে বাবা আমি যাইবার পারমু না।

অবশেষে গনু মোল্লাকে আসতে হলো।

উঠোন থেকে মকবুলের নাম ধরে ডাকলো সে।

মকবুল বেরুলো না। বেরিয়ে এলো টুনি।

একটু পরে ভেতরে এসে টুনি বললো, আপনারে যাইতে কয়।

গনু মোল্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ো মকবুল বললো, ক্যান, ক্যান যাইতে কয়।

টুনি বললো, কী কথা আছে।

মকবুল বললো, কথা এইহানে আইসা কইতে পারে না। আমি যামু ক্যান?

টুনি ওকে শান্ত করলো। বললো, মাথা গরম কইরেন না, যান না ওরা কী কয় শুনেন গিয়া।

স্ত্রীর মুখের দিকে পরম নির্ভয়তার সঙ্গে তাকালো বুড়ো মকবুল। তারপর ধীরেধীরে দাঁড়ালো সে।

বুড়ো মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসলো সবাই। কারো মুখে কথা নাই।

টুনি এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো মকবুলের পাশে।

গনু মোল্লা তার নামাজের চৌকিটার উপর বসলো।

সবাই চুপ।

কেউ কিছু বলছে না।

কথাটা কী দিয়ে যে শুরু করবে ভেবে উঠতে পারছে না কেউ।

টুনিই প্রথম কথা বললো, কই আপনেরা কিছু কইতেছেন না ক্যান। ক্যান ডাকছেন কন না।

সুরত আলী নড়েচড়ে বসলো।

আমেনা নীরব।

ফাতেমা মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গনু মোল্লা বললো, মন্তুর বিয়ার ব্যাপারে কী অইছে। কথাটা বলে মকবুলের দিকে তাকালো সে।

বুড়ো মকবুল কোনো জবাব দেবার আগেই টুনি বললো, মন্তু কইছে ও আম্বিয়ারে বিয়ে করবো না।

ওর কথা শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল সবাই।

আমেনা ফিসফিসিয়ে বললো, মিছা কথা।

ফকিরের মা বললো, কই মন্তু মিয়া কই, তারে ডাহ না।

কিন্তু মন্তুকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। টুনি বললো, লাগব না ওরে, ও আমারে কইছে বিয়া কইরবো না।

আবুল সঙ্গেসঙ্গে বলে উঠলো, তাইলে আমি বিয়া করুম আম্বিয়ারে। আমার ঘরে বউ নাই, খানাপিনার অসুবিধা অয়।

ওর কথা সম্পূর্ণ না-হতেই আমেনা আর ফাতেমা একসঙ্গে বলে উঠলো, হুঁ তোমার একটা বউ দরকার।

বুড়ো মকবুল টুনির দিকে তাকালো।

টুনি বললো, ক্যান, ধইরা ধইরা মাইরা কবরে পাঠাইবার লাইগা নাহি।

আবুল রেগে উঠলো, আমার বউ যদি আমি মারি তোমার তাতে কী ?

চুপ কর বেয়াদব, হঠাৎ গর্জে উঠলো মকবুল। এই জিন্দেগিতে আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন-তিনটা মাইয়ারে তুই কবরে পাঠাইছস। আবার বিয়ার নাম করছ, শরমও লাগে না। একটুখানি দম নিয়ে বুড়ো পরক্ষণে বললো, আম্বিয়ারে আমি বিয়া করমু ঠিক করছি। বলে টুনির দিকে তাকালো সে।

আমেনা আর ফাতেমা পরমুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, আপনেরা শুনছেন, শুনছেন আপনেরা। ইতা কিতা কইবার লাগছে উনি।

যা কইছি ঠিক কইছি। আঙুল তুলে ওদের দুইজনকে শাসালো মকবুল। তোমাগো যদি ভালো না লাগে তোমরা বাড়ি ছাইড়া চইলা যাও।

শুনছেন, শুনছেন আপনেরা। কী কয় শুনছেন। আমেনা কেঁদে ফেললো।

গনু মোল্লা বললো, এইডা ঠিক অইলো না মকবুল মিয়া। এইডা কোনো কামের কথা অইলো না। এই বুড়া বয়সে আরেকডা বিয়া কইরলে মানুষে কী কইবো।

সুরত আলী আর ফকিরের মা বললো, মাইনষে বাড়ির বদনাম করবো।

আমেনা বললো, মাইয়া বিয়া দিছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছি ছি কইরবো না।

কটমট চোখে আমেনার দিকে তাকালো মকবুল।

ফাতেমা বললো, বুড়া বয়সে ভূতে পাইছে।

নিমকহারাম, বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো সে। ঘরের মাঝখানে, এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে একসঙ্গে তালাক দিয়ে দিলো সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইকা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠলো।

পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে পড়লো আমেনা।

ফাতেমা মূর্ছা গেলো।

ফকিরের মা চিৎকার করে উঠলো, আহারে পোড়াকপাইল্যা, এই কী কইরলি তুই, ওরে পোড়াকপাইল্যা এই কী কইরলি।

আবুল হঠাৎ বসার পিঁড়িটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারলো মকবুলের কপাল লক্ষ করে। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ অ্যাঁ। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ বেআক্কেইলা কোন্‌হানের।

দু–হাতে কপাল চেপে মাটিতে বসে পড়লো মকবুল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকির মতো রক্ত ঝরছে ওর।

কান্না, চিৎকার, গালাগালি আর হা-হুতাশে সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নরকের রূপ নিলো।

মকবুলকে দু–হাতে কাছে টেনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো টুনি।

ফাতেমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলো সালেহা।

ফকিরের মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেললো। উঠোনের এক–কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনলো মন্তু। সব দেখলো সে। কিন্তু কাউকে কিছু বললো না। নীরবে পরীর দীঘির দিকে চলে গেলো সে।

পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে গেলো ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটিকে সচকিত করে গেলো। এতদিনের গড়ে তোলা সংসার একমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ঘরের পেছনে লাগানো লাউ–কুমড়োর মাচাগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমেনা। যাবার সময় ফকিরের মাকে কেঁদে কেঁদে বলে গেলো, হীরনরে খবরডা দিয়ো না। শুইনলে মাইয়া আমার বুক ভাসায়া মইরা যাইব। খোদার কসম রইলো বুয়া, মাইয়ারে আমার খবরডা দিয়ো না।

ফাতেমাকে নেয়ার জন্য ভাই এসেছিলো ওর। যাবার সময় বাড়ির সবাইকে শাসিয়ে গেছে ও । বলে গেছে শিকদারবাড়ির লোকগুলোকে একহাত দেখে নেবে সে। বোনের জন্যে চিন্তা করে না ও। আগামী তিনমাসের মধ্যে এর চেয়ে দশগুণ ভালো ঘর দেখে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

মকবুল বিছানায়। মাথায় ওর একটা পট্টি বেঁধে দিয়েছে টুনি। হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে বুড়োর। মাঝে দু–একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলো, এখন নীরবে ঘুমুচ্ছে। টুনি ওর পাশে বসে বাতাস করছে ওকে।

রাতে গনু মোল্লা এলো ওর ঘরে। বুড়ো মকবুলের গায়ে–মাথায় হাত দিয়ে ওর জ্বর আছে কিনা দেখলো। তারপর আস্তে করে বললো, রাগের মাথায় ইতা কিতা কইরলা মিয়া। শরীর ভালা হইয়া গেলে ভাবীসাবগোরে বাড়ি নিয়া আহো। রাগের মাথায় তালাক দিলে তো আর তালাক অয় না। ওই তালাক অয় নাই তোমার।

একবাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো টুনি। আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ করে গেলো।

টুনির উপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে–সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী।

উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে কথা বললো। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা।

টুনি নির্বিকার। একটি কথার জবাব দিলো না।

দিনকয়েক পরে আম্বিয়ার চাচা ছমির শেখ জানিয়ে দিয়ে গেলো বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করবে না আম্বিয়া। তাছাড়া খুব শিগ্রী আম্বিয়ার বিয়ের সম্ভাবনাও নেই।

কথাটা শুনলো বুড়ো মকবুল। শুনে কোনো ভাবান্তর হলো না। ঘরের কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। ইদানীং দিনরাত মকবুলের সেবা-শুশ্রূষা করছে টুনি। সারাক্ষণ ও ওর আশেপাশে থাকে। একটু অবকাশ পেয়ে রসুইঘরে গিয়ে রান্নাবান্নার পাটটা সেরে আসে সে। মরিচক্ষেত আর লাউ-কুমড়োর গাছগুলোর তদারক করে আসে। মাঝেমাঝে ফকিরের মা আর সালেহার আলাপ শুনে টুনি। মন্তু আর আম্বিয়াকে নিয়ে আলাপ করে ওরা। আজকাল নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আম্বিয়াদের বাড়ি থাকে মন্তু। টুনি শুনে। কিছুই বলে না। একদিন বিকেলে মন্তু যখন বাইরে বেরুবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়ালো টুনি। বললো, জ্বরডা ওর ভীষণ বাইরা গেছে। কবিরাজের কাছ থাইকা একটু ওষুধ আইনা দিবা?

ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তু। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি। হঠাৎ বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গেছে ওর। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চুলগুলো শুকনো।

মন্তু ইতস্তত করছিলো।

টুনি আবার বললো, আজকা নাহয় মাঝি-বাড়ি নাই গেলা। একটু ওষুধটা আইনা দাও। ওর ঠোঁটের কোণে একটুকরো ম্লান হাসি।

মন্তু বললো, মাঝি-বাড়ি না গেলে তুমি খুশি অও?

টুনি পরক্ষণে শুধালো, আমার খুশি দিয়া তুমি কইরবা কী?

মন্তু কী জবাব দেবে ভেবে পেলো না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, যাইবা না ক্যা, একশোবার যাইবা। পুরুষমানুষ তুমি কতদিন আর একা-একা থাইকবা।

ঘর থেকে বুড়ো মকবুলের ডাক শুনে আর সেখানে দাঁড়ালো না টুনি। পরক্ষণে চলে গেলো সে।

ও চলে যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মন্তু। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

রাতে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো মন্তু। বর্ষা এগিয়ে আসছে। আম্বিয়া বলেছে নৌকোটা ঠিক করে নেবার জন্য। চাচা ছমির শেখ চেয়েছিলো নৌকোটা নিজে বাইবে। কিন্তু আম্বিয়া রাজি হয়নি। মন্তু ছাড়া অন্য কাউকে ওতে হাত দেবার অধিকার দিতে রাজি নয় সে।

ছমির শেখ রেগে গালাগাল দিয়েছে ওকে। মন্তু সম্পর্কে কতগুলো অশ্লীল মন্তব্য করে বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার মিলামিশা কিন্তুক ভালো অইতাছে না আম্বিয়া। গেরামের লোকজনে পাঁচরকম কথাবার্তা কইতাছে।

কউক। তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আম্বিয়া।

ওর স্পষ্ট উত্তরে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গেসঙ্গে সামলে নিয়েছে ছমির শেখ। বলেছে, তোমার কিছু আহে না আহে, আমাগো আহে। মন্তুরে কিন্তুক এই বাড়িতে আইতে নিষেধ কইরা দিও বইলা দিলাম।

তবু বারবার মন্তুকে বাড়িতে ডেকেছে আম্বিয়া।

ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।

আজও মন্তুর জন্যে অপেক্ষা করছিলো আম্বিয়া। চুলে তেল দিয়ে সুন্দর করে চুলটা আঁচড়েছে সে। সিঁথি কেটেছে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল টুকটুকে করে তুলছে।

ও আসতে একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিলো আম্বিয়া।

অর্ধেকটা মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সলজ্জে হাসির ঈষৎ আভাটা চোখে পড়েও যেন পড়তে চায় না।

আম্বিয়া বললো, এত দেরি অইলো ?

মন্তু বললো, কবিরাজের কাছে গিছলাম।

কেন গিয়েছিলো তা নিয়ে আর প্রশ্ন করে না আম্বিয়া।

দূরে, নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে আড়চোখে বারবার এদিকে তাকায় ছমির শেখ আর বিড়বিড় করে কী যেন সব বলে।

রাতে ওখানে খেলো মন্তু।

পানটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বাইরে তখন ইলশেগুঁড়ি ঝরছে।

ক'দিন পরপর বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। পানির সঙ্গেসঙ্গে ছোট ছোট বেলে আর পুঁটি ছুটোছুটি করছিলো এদিকে-সেদিকে।

অন্ধকারের ভেতর মকু আর ছকু দু-ভাই মাছ ধরছিলো বসে বসে। মন্তুকে দেখে বললো, কি মিয়া এত রাইতে কোন্‌দিক থাইকা ?

মাঝি-বাড়ি।

হুঁ। একটা পুঁটিমাছ ধরে নিয়ে ছকু বললো, চইল্যা যাও ক্যান মন্তু মিয়া। তামাক খাইয়া যাও।

না মিয়া শরীরডা ভালা নাই।

মন্তু যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে মকু বললো, আরে মিয়া যাইবা আর কী, বও। কথা আছে।

কী কথা কও। জলদি কও। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে মাটিতে বসলো মন্তু।

নিঝুম রাত। শুধু একটানা জল গড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। মাঝেমাঝে দু-একটা ব্যাঙ ডাকছে এখানে-ওখানে। আরো তিন-চারটে পুঁটিমাছ ধরে নিয়ে ছকু আস্তে বললো, কি মন্তু মিয়া, তুমি নাহি করিমের বইন আম্বিয়ারে বিয়া কইরতাছ হুনলাম। বলে অন্ধকারে ঘোঁৎঘোঁৎ করে হাসলো সে।

তামাক খেতে খেতে ওর দিকে তাকালো মন্তু। কিছু বললো না।

মকু বললো, ভালো মাইয়ার উপর তোমার চোখ পইড়ছে মন্তু মিয়া। তোমার পছন্দের তারিফ কবন লাগে। অমন মাইয়া এই দুই চাইর গেরামে নাই। আহা সারা গায়ে যেন যৈবন ঢলঢল করতাছে।

কি মন্তু মিয়া চুপ কইরা রইলা যে ? ওকে কনুইয়ের একটা গুঁতো মারলো ছকু। বিয়া শাদি করবার আগে আমাগোরে একটু জানাইয়ো, একটু দাওয়াত তাওয়াত কইরো।

করমু। করমু। আগে বিয়া ঠিক হোক তারপর করমু। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে।

দাওয়ার পাশে টুনি দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ চেনা যায় না।

মন্তুর পায়ের গতিটা শ্লথ হয়ে এলো।

উঠোনে সালেহা আর ফকিরের মা বসে। মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে নিয়ে রসালো আলোচনা করছে ওরা।

আম্বিয়ার চাচা আজ বলেছে, সামনের শুক্রবার জুমার নামাজের পর গাঁয়ের মাতবরদের কাছে কথাটা তুলবে সে। বিচার চাইবে। এই-যে রাতে বিরাতে আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর এত অন্তরঙ্গ মেলামেশা— এ শুধু সামাজিক অন্যায় নয়, অধর্মও বটে।

তাই নিয়ে মসজিদে বিচার বসাবে আম্বিয়ার চাচা।

ফকিরের মা বললো, আমি কিন্তুক একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলুক্ষুইনা। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।

সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ঠিক কইছ চাচী।

কথাটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আম্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল। নিজেও মরছে মরণ-রোগে।

উঠোনে এসে একমুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো মন্তু।

সালেহা আর ফকিরের মা কথা থামিয়ে তাকালো ওর দিকে।

টুনি কিছু বললো না। একটু নড়লো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

মন্তু ওর ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দিলো।

কাল ভোরে আবার বেরুতে হবে ওকে।

## ॥ দশ ॥

অবশেষে বুড়ো মকবুল মারা গেলো।

ধলপহর দেখা দেবার অনেক আগে যখন সারাগ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো সে।

সারারাতে কেউ ঘুমোল না।

গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সালেহা, মন্তু, টুনি, সবাই জেগে রইল মাথার পাশে। সন্ধেবেলা ফকিরের মা বলছিলো, লক্ষণ বড় ভালা না। তোমরা কেউ ঘুমায়ো না মিয়ারা, জাইগা থাইকো।

বহুলোককে হাতের ওপর দিয়ে মরতে দেখেছে ফকিরের মা। তাই, রোগীর চেহারা আর তার ভাবভঙ্গি দেখে সে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।

সারারাত প্রলাপ বকেছে বুড়ো মকবুল।

কখনো আমেনার নাম ধরে ডেকেছে সে। কখনো ফাতেমার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছে। আবার কখনো প্রলাপের ঘোরে গরু তাড়িয়েছে। হুঁ হট হট । আরে মরার গরু চলে না ক্যান। হুঁ হট হট।

মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ কোরান শরিফ পড়ল গনু মোল্লা।

তারপর ধীরেধীরে নিস্তেজ হয় এলো বুড়ো মকবুল। প্রলাপ বন্ধ হলো। একটু পরে মারা গেল সে।

ওর বুকের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো টুনি।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।

তার বিলাপের শব্দ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে দূর পরীর দীঘির পাড়ে মিলিয়ে গেলো।

বিস্ময়ভরা চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু।

পরদিন দুপুরে বুড়ো মকবুলের মৃতদেহটা যখন কাফনে আবৃত করে খাটিয়ার ওপর তোলা হলো তখন বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠোনের মাঝখানে ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাতে লাগলো টুনি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নানা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো ওকে। সালেহা, ফকিরের মা, সুরতের বউ ওরাও অনেক কান্নাকাটি করলো অনেকক্ষণ ধরে।

পরীর দীঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলকে কবর দিয়ে আসার পর সবার মনে হলো বাড়িটা যেন কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে গাছের পাতায়। ঘরের চালে। উঠোনে। বাড়ির পেছনে। ছোট্ট পুকুরে আর সবার মনে। একটি লোক দীর্ঘদিন ধরে যে একবারও ঘরের দাওয়ায় বেরুতে পারেনি, বিছানায় পড়েছিলো। যার অস্তিত্ব ছিলো কি ছিলো না সহসা অনুভব করা যেতো না। সে লোকটা আজ নেই। কিন্তু তার এই না–থাকাই যেন সমস্ত থাকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।

সারা দুপুর টুনি কাঁদল।

সারা বিকেল।

সারা সন্ধ্যা।

সালেহা অনেক চেষ্টা করলো ওকে কিছু খাওয়াতে। সে খেলো না।

ফকিরের মা বললো, কিছু খাও বউ। না খাইলে শরীর খারাপ অইয়া যাইবো। কিছু খাও।

তবু খেলো না টুনি।

মন্তু, সুরত আলী, আবুল, রশীদ কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেউ দাওয়ায়, কেউ উঠোনে, কেউ দোরগোড়ায় বসে।

আজ সহসা যেনো সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

মিয়া–বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে গামছাটা কাঁধে চড়িয়ে নামাজ পড়তে চলে গেলো গনু মোল্লা। সুরত আলী, রশীদ আর আবুলও উঠে দাঁড়ালো।

রোজ যে তারা নামাজ পড়ে তা নয়। কিন্তু আজ পড়বে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যু হঠাৎ পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে ওদের। পুকুর থেকে ওজু করে এসে সুরত আলী বললো, কই, যাইবা না মন্তু মিয়া?

মন্তু ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, চলো। বলতে গিয়ে গলাটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো ওর।

দিন তিনেক পর নৌকা নিয়ে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল মন্তু।

টুনি ডাকলো, শোনো।

মন্তু তাকিয়ে দেখলো এ কয়দিনে ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি।

চোয়ালের হাড়দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার।

মুখখানা বিষণ্ন। মাথায় ছোট একটা ঘোমটা।

মন্তু বললো, কী।

টুনি চারপাশে তাকিয়ে আস্তে করে বললো, আমার একডা কথা রাইখবা?

মন্তু বললো, কও।

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো টুনি। তারপর আস্তে করে বললো, আমারে একদিন সময় কইরা আমাগো বাড়ি পৌঁছায়া দিয়া আইবা ? টুনির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে এ বাড়ির সাথে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে টুনির। আর কতদিন এখানে এমনি করে পড়ে থাকবে সে।

মন্তু আস্তে করে বললো, ঠিক আছে যামুনি। কোন্‌দিন যাইবা ?

টুনি মৃদু গলায় বললো, যেইদিন তোমার সুবিধা হয়। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো সে।

মন্তু বিব্রতবোধ করলো। কী বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে, ভেবে পেলো না সে।

টুনি একটু পরে কান্না থামিয়ে বললো, বড় ইচ্ছা আছিল তোমার বিয়া দেইখা যামু, তোমার হাতে মেন্দি পরাইয়া যামু। থাকন আর গেলো না।

এ কথার আর উত্তর দিলো না মন্তু। গাঁয়ে সবাই জানে, সামনের শীতে আম্বিয়াকে বিয়ে করছে ও। টুনিও জানে।

কাপড়ের আঁচলে চোখের পানি মুছে টুনি আবার বললো, বিয়ার সময় আমারে নাইয়র আনবা না ?

নিস্তেজ গলায় মন্তু পরক্ষণে বললো, আনমু।

সহসা ওর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকালো টুনি। একটুকরো ম্লান হাসিতে ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠলো ওর। আস্তে করে বললো, কথা দিলা মনে থাহে যেন।

মন্তু বললো, থাকবো।

একে-একে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিল টুনি।

সবার গলা জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষ": করে কাঁদলো সে।

পরীর দীঘির পাড়ের উপর দিয়ে আসার সময় দূর থেকে বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়লো। শুকনো মাটির সাদা ঢেলাগুলো ঢিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে। কী এক অজানা ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে যেন।

ভাটার স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে দিলো মন্তু।

সেই নৌকো।

যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলো সে। দু-ধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখ পড়ে শুধু অথৈ জলের ঢেউ। বর্ষার পানিতে নদী নালা ক্ষেত সব এক হয়ে গেছে। এ সময়ে ভরা নদী দিয়ে নৌকো চালানোর প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের ধারে গেরস্থ-বাড়ির পেছনের ডোবার পাশে দিয়ে নৌকো চালিয়ে নেয়া যায়। এতে করে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

টুনি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো। মাথায় ছোট একখানা ঘোমটা।

মন্তু সহসা বললো, বাইরে আইসা বসো না। গায়ে বাতাস লাইগবো।

টুনি পরক্ষণে বললো, আইতাছি।

কিন্তু সহসা এলো না সে। বাইরে কাঠের পাটাতনের উপরে ছোট হয়ে বসলো সে।

সেই নদী।

আগে যেমনটি ছিলো তেমনি আছে।

আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খেলা করলো না টুনি। উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকালো না কোনো দিকে।

শুধু বললো, আম্বিয়ারে বিয়া কইরলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না?

মন্তু সংক্ষেপে বললো, হুঁ।

টুনি বললো, বিয়ার পরে এই বাড়িতে থাকবা, না আম্বিয়াগো বাড়ি চইলা যাইবা?

এ কথার কোনো জবাব দিলো না মন্তু। সে শুধু দেখলো, ঘোমটার ফাঁকে একজোড়া চোখ গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

উত্তর না-পেয়ে টুনি আবার বললো, চুপ কইরা রইলা যে?

মন্তু হঠাৎ দূরে আঙুল দেখিয়ে বললো, শান্তির হাট।

টুনি চমকে তাকালো সেদিকে।

ভাটার স্রোতে ঠেলে নৌকোটা ধীরেধীরে এগিয়ে চলেছে শান্তির হাটের দিকে। সার বাঁধা দোকানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

সহসা জোরে দাঁড় টানতে লাগলো মন্তু। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো নৌকো। পড়তে গিয়ে সঙ্গেসঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো টুনি। মাথার উপর থেকে ঘোমটাটা পড়ে যেতে পরক্ষণেই সেটা তুলে নিলো আবার।

মন্তু একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গভীরভাবে কী যেন দেখছে সে।

নৌকোটাকে ঘাটের দিকে এগুতে দেখে টুনি বললো, ঘাটে ভিড়াইতাছ ক্যান, নামবা নাকি?

মন্তু চুপ করে রইলো।

টুনি আবার বললো, হাটে কি কোনো কাম আছে?

মন্তু মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ মরিয়া গলায় বললো, মনোয়ার হাজীরে কথা দিছিলাম ওর ওইখানে এক রাইতের লাইগা নাইয়র থাকুম। চলো যাই।

টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা সজোরে নাড়া দিল। মুহূর্তে চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল ওর। মন্তুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে।

মন্তু আবার বললো, মনোয়ার হাজীরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিব। আবেগে গলাটা কাঁপছে ওর।

টুনির চোখের কোণে তখন দু-ফোটা জল চিকচিক করছে। অত্যন্ত ধীরেধীরে মাথাটা নাড়ালো সে। আর অতি চাপা-স্বরে ফিসফিস করে বললো, না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।

হাতের বৈঠাটা ছেড়ে দিয়ে বোবা চাউনি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু। একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরুলো না ওর।

তারপর।

তারপর নদীর স্রোত বয়ে চললো। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।

সেদিন হাটবার। সওদা করে বাড়ি ফিরছে মন্তু। দু-পয়সার পান। একআনার তামাক। আর দশপয়সার বাতাসা।

কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু। ঘরে ঘরে ধান উঠছে। অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না। কাজ আর কাজ। সারাদিন ধান কেটে এনে পালা দিয়ে রাখে। রাতে গরু দিয়ে মাড়ায়। তারপর ঝেড়েমুছে সব পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে রাত অনেক গড়িয়ে পড়ে।

হাট থেকে বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখে, উঠোনে আসর জমিয়ে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা। মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে। দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।

আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়লো মন্তুর।

বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।

কেউ নেই।

জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।

টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর।

প্রথম-প্রথম খোঁজখবর নিতো। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর। সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।

হীরন আজকাল বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। বহু আগে প্রথম স্বামী তালাক দিয়েছে ওকে। আবার বিয়ে হয়েছিলো। বছর তিন-চারেক ঘর-সংসার করার পর সেখান থেকেও তালাক পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আর বিয়ে হয়নি।

এবার ওর একটা ভালো দেখে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মন্তু। এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়ো। যে-কোনো কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।

উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওর হাত থেকে পান, তামাক আর বাতাসাগুলি এগিয়ে নিলো আম্বিয়া। তারপর কোলের বাচ্চাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, দুপুর থাইকা কানছে, একটু কোলে নাও।

কোলে নিয়ে ছেলেকে আদর করলো সে।

মন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসালো ওকে। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে গেলো আম্বিয়া।

ধীরেধীরে রাত বাড়তে লাগলো। চাঁদ হেলে পড়লো পশ্চিমে। উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। পরীর দীঘির পাড়ে একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেলো। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেলো।

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূপের পরী।

সুর করে ঢুলে একমনে পুঁথি পড়ছে সে। রাত বাড়ছে। হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।

---